ছোটনাগপুরের জঙ্গলে

সঙ্কর্ষণ রায়

অনন্য প্রকাশন ৬৬, কলেজ স্ট্রিট (দ্বিতল)
কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৬৩। প্রকাশক হীরক রায় অনন্ত প্রকাশন, ৬৬ কলেজ স্ট্রিট (দ্বিতল) কলকাতা ৭৩। মুদ্রাকর, বঙ্কিম পাল নিউ পাল প্রেস। প্রচ্ছদ ধীরেন শাসমল।

উৎসর্গ

গোপীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রীতিভাজনেষু

১

আমার কর্মজীবনের বনপর্ব শেষ হতে চলেছে। সরুয়াবিলের কাজ বন্ধ ক'রে কলকাতায় ফিরে যেতে হবে আমাকে—এই মর্মে নির্দেশপত্র পেয়েছি অধিকর্তার কাছ থেকে। চিঠিটা পাওয়ামাত্র আমার মন খারাপ হয়ে যায়।

সুদীর্ঘ বনবাসের পর আমাদের সাধের শহর কলকাতায় ফিরে আসার এমনি দুর্লভ সুযোগ পেয়েও আমার খুশি হতে না পারা আমার সহকর্মীদের বিস্মিত করে। আমার মধ্যে তারা যেন এক অসামাজিক বন্যতাকে প্রত্যক্ষ করে।

সহকর্মীদের বিস্ময়ের আলোয় আত্মবিশ্লেষণ করতে গিয়ে সত্যিই নিজের মধ্যে বুদ্ধির অতীত বন্যতাকে দেখতে পাই। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর "পালামৌ" বইটিতে লিখেছিলেনঃ "বন্যরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।" সঞ্জীবচন্দ্রের এই উক্তিকে প্রসারিত ক'রে বলা যেতে পারে যে শুধু বন্যরা নয়, ভূতাত্ত্বিকরাও বনের মধ্যেই শোভা পায়—নাগরিক পরিবেশের মধ্যে বিন্দুমাত্রও খাপ খায় না তাদের অস্তিত্ব। আমার নিজের কাছে কলকাতার নাগরিক পরিবেশের মধ্যে প্রত্যাবর্তনের এই আদেশ নির্বাসনদণ্ডের মতই পীড়াদায়ক।

কিন্তু যতই পীড়াদায়ক হোক না কেন, সরকারী হুকুম সর্বদাই পালনীয়। কাজেই ক্যাম্প গুটিয়ে ফেলার আয়োজন করি। একে একে তাঁবুগুলো সব নামিয়ে এনে ভাঁজ ক'রে ফেলার ব্যবস্থা করি। দেখতে দেখতে ঘুচে যায় আমার তাঁবুর আশ্রয়, ঠাই নিই স্থানীয় বিশ্রামগৃহে। তাঁবু ও অন্যান্য জিনিসপত্র সব ফেরৎ নিয়ে যাবার জন্য কলকাতা থেকে ট্রাক পাঠিয়ে দিতে লিখি ওপরওয়ালাকে।

এখানকার কাজ বন্ধ, বিশ্রামগৃহে এখন শুধু বিশ্রাম এবং ট্রাকের জন্য প্রতীক্ষা। এই অখণ্ড অবকাশের মধ্যে দিয়ে চারপাশের ঘন বন ও বনরাজিনীলা পাহাড়কে যেন নতুন ক'রে চেনার সুযোগ পাই।

কটক জেলার অন্তর্গত এই অরণ্যক্ষেত্রে খুব বড়ো আকারের শাল, পিয়াশাল, আসান প্রভৃতি গাছ লালচে বাদামী রংয়ের মাটি ও ল্যাটেরাইটকে চাপা দিয়ে রেখেছে। জায়গায় জায়গায় বড়ো আকারের গাছগুলো অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে, দেখা দিয়েছে লতাঝোপ। এখন চৈত্রমাস, ফুল ফুটেছে লতাঝোপে, মঞ্জরী ধরেছে শালগাছে। শাল-মঞ্জরীর সুবাস জড়ানো বনের মধ্যে পায়চারি করতে করতে একটা অপরূপ ভাবের আবেগে শিউরে ওঠে আমার বুকের ভেতরটা। আমার মনে হয় ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে বর্ণিত দেবী অরণ্যানী যেন এই সব গাছপালার জড়াজড়ির মধ্যে আসন পেতেছেন। সন্ধ্যার পর চারপাশের বন, পাহাড় ও আকাশ যখন অন্ধকারে একাকার হয়ে যায়, তখন ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকের মধ্যে যেন অরণ্যানী দেবীর পূজার ঘণ্টা শুনতে পাই।

এমন বিচিত্র অনুভূতি আগে কখনো হয়নি আমার। এ পর্যন্ত বনের মোহন রূপের আড়ালে মাটি ও পাথরের স্তরের তলায় খনিজ সম্পদের খোঁজ নিয়েছি। উড়িষ্যার কটক জেলার এই বনাঞ্চলে গাছ-পালার নিবিড় আচ্ছাদন চাপা দিয়ে রেখেছে একটি দুর্লভ ধাতুযুক্ত খনিজের সম্ভারকে। লালমাটি ও ল্যাটেরাইটের স্তরের তলায় তার অস্তিত্ব মাটির ওপরে গাছপালায় বিন্যাসের মধ্যে প্রতিফলিত। গাছ-

পালার এই বিশেষ বিন্যাস মানচিত্রের মধ্যে চিহ্নিত করতে করতে বনকে বৈজ্ঞানিক ভাবে চিনলেও তার সঙ্গে পরিচয় যেন তেমন নিবিড় হয়ে ওঠেনি। কিন্তু এখন তো আর কোন কাজ নেই, ভূ-বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার দায়দায়িত্ব থেকে আপাততঃ মুক্ত আমি কাজেই বনকে নিরাসক্ত চোখে দেখার অবকাশ হয়েছে। নিষ্কাম দৃষ্টি দিয়েই নাকি নারীর সত্যিকারের রূপ উপলব্ধি সম্ভব। নন্দনতত্ত্বের এই গূঢ় তত্ত্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ক্ষেত্রেও হয়তো প্রযোজ্য—কারণ কাজকর্মের দায়-দায়িত্বহীন উদ্দেশ্যবর্জিত বিচরণের মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ আমার মনের সঙ্গে বনের পরিচয় হয় নিবিড় থেকে নিবিড়তর। বিরাট বনস্পতি শ্রেণীর গাছের সমাবেশের মধ্যে পায়চারি করতে করতে বনভূমির অঙ্গে অঙ্গে মাখানো নিবিড় রহস্যের স্পর্শ পাই।

এমন সুতীব্র রহস্যানুভূতি ঘটেনি কাজের সূত্রে ঘোরাঘুরি করতে করতে। প্রকৃতির যে মোহিনীরূপের মায়া মানুষকে ঘরছাড়া ক'রে ভবঘুরে ক'রে তোলে, তাকে যেন এই প্রথম প্রত্যক্ষ করি শাল আসানের ঋজুতায়, আতঙ্গী কুরচিলতার পাতার সোনালী স্পন্দনে।

কিন্তু বন্য প্রকৃতির অসীমতার সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের সূচনামাত্রেই বেজে উঠেছে বিদায়ের বাঁশি। এ যেন ফুলশয্যার রাতেই নব পরিণীতা বধূর সঙ্গে বিচ্ছেদ। একটা তীক্ষ্ণ ব্যথা শলাকার মতো বিঁধতে থাকে আমার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে।

মনে পড়ে হ্যারি জনস্টন্, মার্কো পোলো, শ্যাকল্‌টন, হাড্‌সন, ম্যাগেলান, কলম্বাস প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত ভবঘুরের কথা। প্রকৃতির মোহিনী রূপের মায়া তাঁদের ঘরছাড়া করেছিল। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাও মনে হল। বনে বনে ঘুরে বনের নেশা পেয়ে বসেছিল তাঁকে, ঘরছাড়া করত অরণ্যের ডাক। তিনি লিখেছিলেন, "অসম্ভব তাহার পক্ষে ঘরকন্না করা, একবার সে ডাক যে শুনিয়াছে, সে অবগুণ্ঠিতা মোহিনীকে একবার যে প্রত্যক্ষ করিয়াছে।"

ঘরকন্না শুধু নয়, তার পক্ষে চাকরী করাও কঠিন। এ পর্যন্ত অবশ্য এদেশের অরণ্যক্ষেত্র ছিল আমার কর্মক্ষেত্র। কিন্তু যে চাকরী এ পর্যন্ত আমাকে বনে বনে বিচরণে বাধ্য করেছিল, সেই একই চাকরি শহরে আমার নির্বাসনের ব্যবস্থা করতে চলেছে। মনে হল এর চেয়ে নিষ্ঠুর পরিহাস যেন আর কিছু হয় না।

কাজেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে এই বনের মধ্যেই ঠাঁই নেবার কথা চিন্তা করতে শুরু করি।

অরণ্যে গভীরে একাকী হরিণ

২

চাকরি হয়তো সত্যিই ছেড়ে দিতাম, চাকরি ছেড়ে দিয়ে খনিজ-সংক্রান্ত স্বাধীন ব্যবসার সূত্রে হয়তো এই বনের সঙ্গে আমার সম্পর্ককে অচ্ছেদ্য করে তুলতাম, কিন্তু হঠাৎ এমন একটি ঘটনা ঘটে গেল যে আমার কলকাতায় বদলির হুকুম বাতিল হয়ে গিয়ে আমার বনবাসের মেয়াদ অনির্দিষ্টকালের জন্য বেড়ে গেল।

সেদিন সন্ধ্যার পর বিশ্রামগৃহের বাইরে বাগানের মধ্যে পায়চারি করছি। অযত্নে ও অবহেলায় এই বাগান অবশ্য চারপাশের বনের সঙ্গে মিশে গিয়েছে, কোথায় বাগানের সীমা তা বোঝার জো নেই। চারপাশের বন ও পাহাড় নিবিড় আঁধারে একাকার হয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। আকাশে জ্বলজ্বল করছে অগণ্য তারা—উত্তরে দৈত্যারি পাহাড়ের মাথায় উঠে এসেছে কালপুরুষ—উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে ছায়াপথ। কৃষ্ণপক্ষের এই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে বনের কিছুই দেখা যাচ্ছে না, গাছপালাগুলোকে তফাৎ করা যাচ্ছে না, কিন্তু তবু আঁধারের ঐক্যবন্ধনে বনের একটা সামগ্রিক রূপ যেন প্রত্যক্ষ করি। দিগন্তলীন নিবিড় কালিমার মধ্যে বনের আত্মা যেন প্রকাশ পাচ্ছেন।

হঠাৎ এই অন্ধকারকে তলোয়ারের মত চিরে ফেলল হেডলাইটের আলো। চারপাশে নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারের মধ্যে এই হঠাৎ আলোর ঝলকানি চমকে দেয় আমাকে। আলোটা এদিকেই এগিয়ে আসছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে তা বিশ্রামগৃহের কাছাকাছি এসে থেমে গেল।

আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাই গাড়িটার দিকে। হেডলাইটের আলোয় তার অস্পষ্ট আদল ফুটে উঠেছে, একটা বড়ো আকারের ল্যাণ্ড রোভার। কাছে গিয়ে দেখি, গাড়িতে চালকের আসনে একজন পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের প্রৌঢ় ছাড়া আর কেউ নেই। আমি তাঁর

পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি মুখ তুলে তাকালেন। বললেন, মিস্টার রায়?

—হ্যাঁ। আমি জবাব দিলাম।

—আপনাদের ডিরেক্টর জেনারেল ডক্টর রায়চৌধুরী পাঠিয়েছেন আমাকে আপনার কাছে। এই যে তাঁর চিঠি···

চিঠিটা খুলে পড়লাম। ডক্টর মিহিরকুমার রায়চৌধুরী লিখেছেন, দেবজ্যোতি রায়কে তোমার কাছে পাঠাচ্ছি, তিনি উড়িষ্যার একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী তাঁর নিরুদ্দিষ্ট ছেলে শুভ্রজ্যোতির সন্ধানে তিনি আমাদের সাহায্য চান। এ কাজের দায়িত্ব তোমাকে আমি দিচ্ছি। শুভ্রজ্যোতি বোধ হয় উড়িষ্যা, বিহার ও মধ্যপ্রদেশের বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওকে খুঁজে বের করতে তোমাকেও ঘুরে বেড়াতে হবে। অতএব কলকাতায় "পাবলিকেশন ডিভিশনে" তোমার বদলির হুকুমটা আপাততঃ আমি মুলতুবী রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। শুভ্রজ্যোতিকে খুঁজে বের করাই তোমার এখনকার কাজ···

চিঠি পড়া শেষ ক'রে আমি মুখ তুলে তাকাতেই দেবজ্যোতি বললেন, এবার আমার কথা শুনুন। আমার ছেলে—

—রেস্ট হাউসে এসে রেস্ট নিন, আমি বাধা দিয়ে বললাম, চা-টা খান, তারপর না হয়···

—রেস্ট নেবার সময় তো আমার নেই ভাই, এখনই আমাকে বোলাঙ্গিরের দিকে যেতে হবে। ওখানে আমাদের একটা কনফারেন্স আছে···

—পাঁচ দশ মিনিট বসে গেলে এমন কিছু দেরি হ'য়ে যাবে না। আসুন···

রেস্ট হাউসের ড্রইংরুমে আমার চাকরের তৈরি করা কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে দেবজ্যোতি বললেন, আমার ছেলে শুভ্রজ্যোতি উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃ-বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করছে, তার হঠাৎ ঝোঁক চেপেছে ভ্যালেনটাইন বল্-এর পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে এদেশের বনে বনে ঘুরে বেড়াবে। ভ্যালেনটাইন বল্-এর নাম শুনেছেন তো?

—হ্যাঁ। আমি জবাব দিলাম, একশো বছর আগেকার বৃটিশ ভূবিজ্ঞানী—এদেশের বনে বনে ঘুরে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা করেছিলেন··· বনে বনে পর্যটনের বৃত্তান্ত লিখে গিয়েছেন তাঁর "Jungle Life of India" বইটিতে।

—জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার লাইব্রেরীতে তাঁর এই বইটা পড়েই শুভ্রজ্যোতির এদেশের বন্য জীবনের সঙ্গে পরিচিত হবার ইচ্ছেটা হয়েছিল। বইটার তুটো ফটোস্ট্যাট কপি করিয়ে নিয়েছিল সে। তুটো কপিরই পাতায় পাতায় লাল পেনসিলের দাগ দিয়ে এক, তুই, তিন, চার ইত্যাদি ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করেছিল। আমাকে বলেছিল, ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী বিভিন্ন জায়গায় যাবে। কপি তুটির একটি আমার কাছে রেখে গিয়েছিল যাতে আমি তার গতিবিধি অনুসরণ করতে পারি। এই নিন আমার কপিটা···

বলে পোর্টফোলিও ব্যাগ থেকে একটা প্যাকেট বের করে আমার হাতে দিলেন দেবজ্যোতি।

—শুভ্রজ্যোতি পর পর কোথায় যাবে তা এর থেকেই পারবেন বুঝতে। দেবজ্যোতি বলে চলেন, পনেরো মাস আগে সে ভুবনেশ্বর থেকে শুরু করেছিল তার যাত্রা—প্রথমে জামসেদপুর হয়ে গিয়েছিল দলমা পাহাড়। সেখান থেকে লেখা তার চিঠি পেয়েছি। তাতে সে লিখেছে যে ওখান থেকে সে পুরুলিয়া জেলার ধাদকা যাবে, আর যে-সব জায়গায় যাওয়ার কথা, সব জায়গাতেই তার পর্যটন-সূচী অনুযায়ী পর পর যাবে।

—ধাদকা থেকে কোন চিঠি দেননি শুভ্রজ্যোতিবাবু? আমি প্রশ্ন করলাম।

—না। ম্লান মুখে জবাব দিলেন দেবজ্যোতিবাবু, দলমা পাহাড় থেকে লেখা চিঠির পর আর কোন চিঠিই পাইনি আমি ওর কাছ থেকে। স্বাভাবিকভাবেই আমার স্ত্রী ও আমি তুজনেই খুব অস্থির হয়ে পড়েছি।

—ওর কোন খবর নেবার চেষ্টা করেন নি? মানে ধাদ্‌কায় গিয়ে সন্ধান নেওয়া···

—তার চেষ্টা করতে গিয়েই আমার আলাপ হল ডক্টর রায়চৌধুরীর সঙ্গে। তিনি আমাকে ও আমার স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়েছেন যে শুভ্রজ্যোতিকে খুঁজে বের করার জন্য যা যা করার সব তাঁর ডিপার্টমেণ্টই করবে···

—এ দায়িত্ব তিনি আমাকেই দিয়েছেন। আমি বললাম, কাজেই যথাকরণীয় সব কিছু আমিই করব···

—আপনার সঙ্গে আমার খুব যাবার ইচ্ছে, কিন্তু স্ত্রী অসুস্থ —তাঁকে একা রেখে বেশিদিনের জন্য বাইরে ঘোরাঘুরি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়···

—তার দরকার নেই কোন। আপনি আমার সঙ্গে না থাকলেও খোঁজাখুঁজিতে কোন ত্রুটি হবে না—আপ্রাণ চেষ্টা করব আমি ওকে খুঁজে বের করতে···

৩

ভ্যালেনটাইন বল্-এর "জাঙ্গল লাইফ অফ্ ইণ্ডিয়া" বইটির মধ্যে দলমা পাহাড়ের বৃত্তান্তকে শুভ্রজ্যোতি পয়লা নম্বর দিয়ে চিহ্নিত করেছে। কাজেই সবার আগে ওদিকে যাই। বম্বে রোড এবং রাঁচির হাইওয়ে দিয়ে জামশেদপুর হয়ে চাণ্ডিলের পথে যাত্রা করি।

সুবর্ণরেখা নদী ছেড়ে মানগো পেরোলাম। তারপর শুরু হল গভীর বন। রাঁচির সড়ক বনটাকে চিরে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে।

ডানদিকে বনে আচ্ছন্ন দলমা পাহাড়—যেন মাটির বুক ফুঁড়ে আকাশের দিকে উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছে একটা অতিকায় সবুজ রংয়ের ঢেউ। রাঁচি রোড থেকে বেরিয়ে বনবিভাগের রাস্তা ঘুরে ঘুরে উঠেছে পাহাড়ের ওপরে। এই রাস্তা ধ'রে চলে আমার জীপ। জীপের পেছনে মালবাহী ট্রেলার, তাতে আমার ও ড্রাইভার জোহান মুণ্ডার সব জিনিসপত্র রয়েছে।

দলমা পাহাড়ের দুরারোহ চড়াইকে বেষ্টন ক'রে ধীরে ধীরে উঠতে থাকে জীপটা। নীচু গীয়ারে গাড়ির আওয়াজ যান্ত্রিক আর্তনাদের মত শোনায়। বন ক্রমশঃ গভীর থেকে গভীরতর হ'য়ে আসে। ১৮৭ - -৭১ সালে ভ্যালেনটাইন বল্ যেমন দেখেছিলেন, অরণ্যের আদিম রূপ তেমনি অবিকৃতই রয়েছে। তাঁর লেখা বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে বিপুল আকারের শালগাছের সমাবেশ। এক একটা শালগাছ যেন কারখানার চিমনীর মত ঠেলে উঠেছে আকাশে। শালগাছের ফাঁকে ফাঁকে দেবকাঞ্চন ফুলের মেলা, রক্তবর্ণ পলাশের সমারোহ। বড়ো বড়ো গাছের মাঝখানকার শূন্যস্থানকে পূর্ণ করেছে কুরচি, বন হলুদ ও বন পানের ঝোপ।

দলমা পাহাড়ে চূড়ার কাছাকাছি কয়েকটি ঝুপড়ি চোখে পড়ল।

কাশ ও লতা ঝোপ থেকে কেটে আনা ডালপালা দিয়ে বাঁধা ছোট্ট ছোট্ট নীচু কুঁড়েঘর। জোহান মুণ্ডা বললে, এটা একটা পাহাড়িয়াদের গ্রাম।

আমি বললাম, গাড়ি থামাও জোহান, এদের সঙ্গে আলাপ ক'রে দেখি এরা কোন খবর রাখে কিনা।

কিন্তু গ্রামের কাছে গিয়ে কাউকেই দেখতে পেলাম না। আমি বললাম, বোধহয় এটা একটা পরিত্যক্ত গ্রাম—এ গ্রাম ছেড়ে বোধ হয় অন্যত্র চলে গিয়েছে এখানকার লোকেরা।

জোহান বললে, না স্যার, গ্রাম ছেড়ে যায়নি ওরা। ঐ দেখুন না টাটকা ছাইয়ের গাদা, কিন্তু মেটে হাঁড়িকুড়িও রয়েছে।

—কিন্তু গেল কোথায় ওরা?

—বনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে কোথাও। আমাদের গাড়ির আওয়াজ শুনেই বোধ হয় পালিয়েছে। সভ্য মানুষদের এড়িয়ে চলাই এদের স্বভাব।

—বল্ সাহেব একশো বছর আগে যেমন দেখেছিলেন তেমনই আছে দেখছি এরা, এতটুকু বদলায় নি।

—এদের স্বভাব কখনোই বদলাবে না স্যার, আর একশো বছর বাদেও ঠিক এমনি অবস্থাতেই এদের দেখা যাবে। তবে সংখ্যায় যত কমে আসছে, হয়তো কয়েক বছরের মধ্যেই এরা পুরোপুরি লোপ পেয়ে যাবে।

বলতে বলতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জোহান।

পাহাড়িয়াদের আসন্ন বিলোপের চেয়ে নিরুদ্দিষ্ট শুভ্রজ্যোতির চিন্তাই আমাকে বেশি বিচলিত করেছিল। এই পাহাড়িয়ারা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যদি শুধু পালিয়েই বেড়ায়, শুভ্রজ্যোতির হদিস এদের কাছ থেকে পাব কী ক'রে ভেবে পাচ্ছিলাম না।

আমার চিন্তাকুল মুখের পানে চেয়ে জোহান অবশ্য ভুল বুঝল, সে ভাবল বুঝি পাহাড়িয়াদের ভবিষ্যতের ভাবনাই আমাকে ক্লিষ্ট করেছে।

সে বলল, আর বেশি ভেবে কী করবেন স্যার, ঈশ্বরের ইচ্ছায় যারা যাবার তারা যাবেই।

আমি বললাম, পাহাড়িয়াদের ভবিষ্যতের কথা নয়, ওদের কাছ থেকে শুভ্রজ্যোতির খবর পাব কী করে তাই ভাবছিলাম। যেরকম পালিয়ে বেড়াচ্ছে, ওদের নাগাল কী আর মিলবে?

—গাড়ি নিয়ে নয়, পায়ে হেঁটে চুপি চুপি আসতে হবে। সন্ধ্যা নাগাদ আসব—এখন চলুন।

আরও খানিকটা চড়াই পেরিয়ে পৌঁছোলাম আমরা দলমার চূড়ায়। ওপরে সমতল অধিত্যকা—তার ঠিক মাঝখানে সরকারী ডাকবাংলা।

স্থানটির গম্ভীর দৃশ্যে মন মুগ্ধ হয়ে গেল। চারপাশে সবুজের ঢল নেমেছে প্রায় আড়াই হাজার ফুট তলায় উপত্যকার অভিমুখে। উচ্চতার দরুন জায়গাটি বেশ ঠাণ্ডা। শাল, মহুয়া, পিয়াশাল, অর্জুন, আসান প্রভৃতি গাছের নিবিড় বেষ্টনী চাপা দিয়ে রেখেছে পাহাড়ের কালো ব্যাস্যাল্টের স্তূপকে।

সন্ধ্যার আগে জোহান মুণ্ডা ও আমি পাহাড়িয়াদের গ্রামের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। সড়ক ধ'রে গেলে অনেকটা ঘুরতে হবে, তাই হরিণের পায়ে পায়ে তৈরী শুঁড়িপথ দিয়ে নামতে থাকি নীচের দিকে। পাহাড়ের গা বেয়ে কয়েকটি গুহার পাশ দিয়ে চলতে থাকি। জোহান ফিসফিসিয়ে বললে, গুহার মধ্যে ভালুক থাকতে পারে, সাবধান।

জোহানের কাছে একটি পুরনো গাদাবন্দুক থাকলেও আমি পুরোপুরি নিরস্ত্র। কাজেই আমার দিক থেকে সাবধান হওয়া মানে পা টিপে টিপে অথবা দ্রুত চলা এবং কোনও বন্য প্রাণী তেড়ে এলেই পালিয়ে যাওয়া।

পাশাপাশি তিন চারটে গুহা আছে। এই গুহাগুলির বর্ণনা ভ্যালেনটাইন বল্-এর বইয়ে আছে। এই গুহাগুলির কোনও একটি থেকে একজোড়া বড়ো আকারের ভালুক বেরিয়ে এসে তাড়া করেছিল বল্ সাহেবকে। সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মাদী ভালুকটিকে মেরেছিলেন বল্

সাহেব। তার সঙ্গী পুরুষ ভালুকটি পালিয়ে যাওয়াতে তার নাগাল অবশ্য পাননি তিনি। গুহার মধ্যে একজোড়া ভালুকের ছানা ছিল, তাদের বার করে আনতেই তারা ছুটে গিয়েছিল মাদী ভালুকটির মৃতদেহের দিকে—তার শুকনো স্তনে মুখ রেখে দুধ খাবার চেষ্টা করেছিল। ভালুকের ছানাদুটিকে খুব যত্ন করে লালন পালন করেছিলেন মিস্টার বল্। তারা একটু বড় হতেই অবশ্য ছেড়ে দিয়েছিলেন তাদের বনের মধ্যে।

গুহাগুলো পেরিয়ে যাই। কোথাও ভালুক লুকিয়ে আছে কিনা বুঝতে পারি না। জোহানও পারে না, তবে তার ধারণা ভালুক আছে এবং আমাদের দিকে নজর রাখছে। আমার হাত ধ'রে দ্রুত হাঁটবার জন্য ইশারা করে সে। প্রায় দৌড়তে দৌড়তে পার হয়ে যাই গুহাগুলো।

—তুমি কী মনে কর গুহার বাইরে ওরা নেই। হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম আমি, গুহাগুলো পেরিয়ে এসে তুমি এমন নিশ্চিন্ত হচ্ছো কী করে!

—কোথায় নিশ্চিন্ত হচ্ছি! ইতস্ততঃ শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে জোহান বললে, বনের মধ্যে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে আমরা নিরাপদ বা নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারি।

হঠাৎ বনের নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে মাদল বেজে ওঠে। জোহান গলার স্বর নামিয়ে প্রায় ফিসফিসিয়ে বললে, পাহাড়িয়াদের গাঁয়ের কাছে এসে গিয়েছি। আমাদের দেখলেই পালাবে, কাজেই পা টিপে টিপে চলুন……

খুব সন্তর্পণে পা ফেলে আমরা ওদের আস্তানার কাছাকাছি পৌঁছে যাই। দুজনে গাছের গুঁড়ির আড়ালে লুকিয়ে থেকে লক্ষ্য করি ওদের।

খর্বাকৃতি প্রায় নগ্ন নারী ও পুরুষ। পুরুষদের পরনে নেংটি, মেয়েরা খুব খাটো আকারের শাড়ি দিয়ে তাদের নিম্নাঙ্গ ঢেকেছে। তাদের নিকষ কালো মুখে চোখে এমনি সহজ সরল বন্যতা প্রকাশ

পাচ্ছে যা হো, সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসীদের মধ্যেও দেখা যায় না। ওদের মধ্যে একজন মাদল বাজাচ্ছে, বাকি সকলে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে একটি ভালুকের মৃতদেহের ওপরে। ওদের হাতের হাতিয়ার দেখতে পাচ্ছি না—তবে চোখের নিমেষে বিশ্লিষ্ট হয় ভালুকের কালো রোমশ চামড়া। কয়েক মিনিটের মধ্যে চামড়ার খোল থেকে অপহৃত ভালুকের দেহটিকে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলল ওরা। তারপর ওরা আগুন জ্বালাল এবং মেয়েরা মাংসের টকরোগুলোকে ঝলসে ফেলতে শুরু করল।

ঝলসানো মাংস শালপাতায় বিছিয়ে সকলে খাওয়ার উদ্যোগ করছে, এমন সময় কাঁধের থলি থেকে নুনের পুঁটলি বের ক'রে তাদের দিকে এগিয়ে গেল জোহান। জোহানকে দেখামাত্র ওরা চমকে উঠলেও খুশি হল নুন পেয়ে। ওকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বসতে বলল আগুনের পাশে।

নুন এই পাহাড়িয়াদের কাছে কতখানি সমাদরের বস্তু তা ওদের হাবভাব দেখে বুঝতে পারি। এই নুনের দরুন জোহানের মত আমিও ওদের আতিথেয়তা লাভ করি। ওদের আতিথেয়তা অবশ্য গ্রহণ করতে পারি না, কারণ ভালুকের মাংস খাবার প্রবৃত্তি আমাদের নেই। আদিবাসী মুণ্ডা হলেও ভালুকের মাংসে জোহানেরও রুচি নেই।

মাংস নিলাম না ব'লে পাহাড়িয়ারা রীতিমত অস্বস্তি বোধ করে। জোহানের দেওয়া নুনের বিনিময়ে কী দেবে আমাদের ভেবে না পেয়ে ওরা অস্থির হ'য়ে ওঠে। হাটে ওরা চাকভাঙ্গা মধু, ধূপ বা লাক্ষার বিনিময়ে নুন, গামছা,কাপড় ইত্যাদি সংগ্রহ ক'রে থাকে। কিন্তু এখন ওদের কাছে এই ভালুকের মাংস ছাড়া আর কিছুই নেই। আভাসে ইঙ্গিতে ওদের লজ্জা ও দুঃখ প্রকাশ করে এবং খুব শিগগিরই এই ঋণ শোধ ক'রে দেবার প্রতিশ্রুতিও জ্ঞাপন করে।

ওদের দলপতি বা গাঁ-বুড়োর কাঁধে হাত রেখে জোহান ভাঙ্গা ভাঙ্গা পাহাড়িয়া ভাষায় বললে, এই নুন আমরা তোমাদের উপহার হিসেবে দিচ্ছি, কাজেই ঋণ শোধ দেবার প্রশ্নই ওঠে না।

—কিন্তু নুন তো অমনি অমনি নিই না আমরা। গাঁ-বুড়ো মুখ কাঁচুমাচু ক'রে বলল, কিছু একটা তোমাদের নিতেই হবে।

—একান্তই যদি কিছু দিতে চাও, আমাদের প্রশ্নের জবাব দাও।

—কী প্রশ্ন? ভুরু কুঁচকে তাকাল জোহানের মুখের পানে: আমরা সাদাসিধা বনের মানুষ, কোন রকম প্যাঁচালো প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না কিন্তু।

—না না, প্যাঁচালো প্রশ্ন করতে চাই না, শুধু জানতে চাই বছর খানেক আগে বাইশ তেইশ বছর বয়সের একটি ছেলে এখানে এসেছিল কিনা? তার পরনে আমার এই সাহেবের মত পোশাক। ব'লে জোহান আমার দিকে তাকাল।

আমার আপাদমস্তক বার কয়েক চোখ বোলাবার পর গাঁ-বুড়ো গম্ভীর মুখে মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, এ রকম চেহারার কোন বাবু তো আসেনি এখানে।

—এ রকম চেহারা নয়। ব'লে শুভ্রজ্যোতির ছবি বের করল জোহান। ছবিটা গাঁ-বুড়োর হাতে দিয়ে বলল, চেহারা তার এই রকম। ভাল ক'রে দেখে বল…

ছবিটা দেখার জন্য গাঁ-বুড়োর পাশে আর সকলে এসে ভিড় করে। বোধ হয় এর আগে কখনোই তারা এ রকম ছবি দেখেনি। সকলে চোখ বড়ো বড়ো ক'রে চেয়ে থাকে।

চুপচাপ ছবিটা দেখে যাচ্ছে সকলে, কারুর মুখে কোন কথা নেই। হঠাৎ একটি বিশ-বাইশ বছরের যুবতী ব'লে উঠল, এই লোকটাই ভালুকের গুহায় ঢুকেছিল, তারপর আর বেরোয়নি…

—অ্যাঁ! বলো কী! জোহান ও আমি দুজনেই আঁতকে উঠি।

গাঁ-বুড়ো গম্ভীর মুখে বললে, একটা মাদী ভালুক একা একা থাকতো তার গুহার মধ্যে, এই জোয়ান ছোকরাকে দেখে টেনে নিয়ে গিয়েছিল তার গুহার মধ্যে। তাকে আর আমরা গুহা থেকে বেরোতে দেখিনি, এর থেকেই আন্দাজ করছি যে সে মাদী ভালুকটার সঙ্গে ঘর করছে।

আমি বললাম, অসম্ভব! ভালুক মানুষের সঙ্গে ঘর করছে এ হতেই পারে না।

—নিশ্চয়ই হতে পারে। গাঁ-বুড়ো জোরে দিয়ে বললে, হামেশাই হচ্ছে। অনেক সময় আমরা আমাদের এখান থেকে জোয়ান বয়সী ছোকরাকে পাঠিয়ে দিই ভালুকের গুহায়....

—যাকে পাঠিয়ে দাও তারা কা ফিরে আসে!

—না। ফিরে আসে না ব'লেই আরো ধ'রে নিই যে সে ভালুকের সঙ্গে সুখে ঘরকন্না করছে।

আমি বললাম, ভালুককে সুখী করার জন্য তোমরা দেখছি তোমাদের ছেলেমেয়েদেরও বলি দিতে পার।

—নিশ্চয়ই। গাঁ-বুড়ো জবাব দিল, ভালুক আমাদের দেবতা—তার সুখেই আমাদের সুখ....

জোহান বললে, আসল কথা হচ্ছে, ভালুকের কাছাকাছি ও পাশাপাশি থাকতে হলে তাদের প্রসন্ন রাখতেই হবে। কিন্তু যাকে দেবতা বলে মানে, তার মাংস খায় কী করে! কী গো গাঁ-বুড়ো, ভালুক তোমাদের দেবতা, তার সুখেই তোমাদের সুখ বলছ, তার মাংস পুড়িয়ে খাবার প্রবৃত্তি তোমাদের হচ্ছে কী ক'রে?

—প্রসাদ পাচ্ছি আমরা। গাঁ-বুড়ো জবাব দিল, এই ভালুক ঠাকুর আর একটা ভালুকের সঙ্গে লড়াই ক'রে মরেছেন। এই জঙ্গলে যে সব জানোয়ার মরে তাদের মাংস খেয়ে তাদের সংকার করি আমরা। ভালুকঠাকুর আমাদের আস্তানার কাছে মারা পড়ে নিজেকে দিয়ে গেছেন আমাদের ক্ষিদে মেটাবার জন্য....

মৃদু হেসে আমি বললাম, দেবতার মাংস প্রসাদ জ্ঞানে ভক্ষণ ব্যাপারটা অভিনব সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষের সঙ্গে ভালুকের ঘরকন্নার ব্যাপারটা একেবারেই আজগুবি। তুমি কী বলো জোহান?

—ব্যাপারটা একেবারে আজগুবি ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায় না স্যার। জোহান গম্ভীর মুখে জবাব দিল, এমন অনেক বিকৃত রুচির মানুষ আছে জানোয়ারদের সঙ্গে দৈহিক সংসর্গ ক'রে যারা সুখ পায়....

—শুভ্রজ্যোতি নিশ্চয়ই সে রকম স্বভাবের ছেলে নয়। উত্তেজিত স্বরে ব'লে উঠলাম।

—নিশ্চয়ই না। কিন্তু এই পাহাড়িয়াদের মধ্যে হয়তো এ ধরনের মানুষ আছে। দেখছেনই তো, এদের সঙ্গে বনের পশুদের খুব একটা তফাৎ নেই।

—কিন্তু ঐ মেয়েটা যে বলছে শুভ্রজ্যোতি একটা মাদী ভালুকের খপ্পরে পড়েছে!

—তা পড়তে পারে। হয়তো সে তার গুহায় আশ্রয় নিতে গিয়ে তার খপ্পরে পড়ে গিয়েছিল।

পাহাড়িয়াদের গ্রাম থেকে যখন বেরিয়ে এলাম, তখন অন্ধকার হ'য়ে এসেছে। চারদিকে বনের অলিগলিতে, যে শুঁড়িপথ দিয়ে হাঁটছি তার মধ্যে ঘন হয়ে নামছে এই অন্ধকার। টর্চের আলো দিয়ে অন্ধকারকে চিরে ফেলতে ফেলতে এগিয়ে যাচ্ছি। চারদিক নিস্তব্ধ। ভয় না পেলেও, গা ছমছম করা একটা বিচিত্র অনুভূতি মনের মধ্যে শিহরণ সঞ্চার করে।

আমার ডাক বাংলোয় পৌছতেই চৌকিদার বললে যে আমাদের খাবার তৈরী, ইচ্ছে করলে আমার রাত্রের খাওয়া সেরে ফেলতে পারি।

কিন্তু জোহান ও আমার দুজনেরই মন এমনি খারাপ হ'য়ে গিয়েছে যে খেতে প্রবৃত্তি হল না। গাঁ-বুড়ো এবং ঐ মেয়েটি শুভ্রজ্যোতি সম্বন্ধে যা বলেছে তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে শুভ্রজ্যোতি ভালুকের পাল্লায় পড়ে তার গুহার মধ্যে আটকা পড়েছিল। পাহাড়িয়ারা তাকে গুহা থেকে বেরোতে দেখেনি, কাজেই তাকে গুহার ভালুক মেরে ফেলেছে ব'লে মনে হল।

জোহানের মুখের ভাবে মনে হল আমার মত সেও চিন্তিত—বোধ হয় শুভ্রজ্যোতি সম্পর্কেই চিন্তা ক'রে যাচ্ছে। আমি বললাম, চিন্তা ক'রে তো কোন ফল পাব না, খোঁজ নেওয়া দরকার।

—ঠিকই বলেছেন। জোহান উঠে দাঁড়াল: চলুন, এখনই বেরিয়ে পড়ি।

—এখনই বেরিয়ে পড়বে কী? আমি অবাক হয়ে বললাম, এই অন্ধকার রাত্রে···

—রাত্রি আর অন্ধকার নেই স্যার—ঐ দেখুন চাঁদ উঠেছে। পূর্ব দিকে দূরের শৈলশ্রেণীর মাথার নিবিড় বনশ্রেণীর কালিমা ভেদ ক'রে আত্মপ্রকাশ করেছে কৃষ্ণপক্ষের একফালি চাঁদ। বোধ হয় একেই বলে 'তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়'। এ এমনি এক আশ্চর্য দৃশ্য যে আমার সমস্ত মন জয়ধ্বনি ক'রে উঠল।

জোহান বললে, জ্যোৎস্নার আলোয়, ভালুকের গুহা অনায়াসে খুঁজে বের করতে পারব। সঙ্গে নেব টর্চ, মশাল জ্বালাবার সরঞ্জাম, আমার রাইফেল। গুহার মধ্যে ঢুকে সন্ধান নিতে একটুও অসুবিধে হবে না।

—কিন্তু গুহার মধ্যে যদি ভালুক থাকে?

—থাকলেও সইতে পারবে না মশালের আগুন—আগুন দেখে যদি ভয় না পায় আমার বন্দুক আছে ···

এরপর আর দ্বিধা করা চলে না। জোহানকে অনুসরণ ক'রে নামতে থাকি চড়াই বেয়ে।

অস্ফুট জ্যোৎস্না বনের অন্ধকারকে পুরোপুরি ঘোচাতে না পারলেও ছায়া মেশানো আলোর জাল বিছিয়ে দেয় গাছগুলির ফাঁকে ফাঁকে। অন্ধকার বিশ্লিষ্ট হয়ে ঘনীভূত হয়ে থাকে গাছপালা ও লতাঝোপের পত্রপুঞ্জে। হরিণদের পায়ে চলা শুঁড়ি পথের ওপর দিয়ে প্রসারিত অস্ফুট রেখা অনুসরণ ক'রে নামতে থাকি ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে···

—হুঁশিয়ার হুজুর। হঠাৎ ফিসফিসিয়ে উঠল জোহান।

—কেন? আমি চমকে উঠে বলি।

—ঐ দেখুন···

জোহানের দৃষ্টি অনুসরণ করে একটি মহুয়া গাছের তলায় মাঝারি আকারের একটি ভালুককে দেখতে পেলাম। গাছের তলায় ঝরে

পড়া মহুয়া-ফুলের রাশির ওপরে ঝুঁকে পড়েছে সে। রসালো মহুয়া-ফুলে ভালুকের বড় লোভ।

তাকিয়ে দেখি প্রকাণ্ড এক ভালুক ···

—দেখছেন স্যার, ভালুকটা ঠিক মানুষের মতই মহুয়া-ফুল কুড়োচ্ছে। জোহান চাপা উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল।

মানুষের মত মহুয়া-ফুলে আসক্তি থাকলেও ভালুকের মহুয়া-ফুল কুড়োনোটা খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু এই ভালুকটা তার সামনের পা দুটি দিয়ে সত্যিই কুড়িয়ে তুলছে মহুয়া-ফুল এবং জমা করছে একটি ঝুড়ির মধ্যে। তার ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে যেন একটি ভালুকবেশী মানুষ।

—ওটা একটা শয়তান হুজুর। কেঁপে ওঠে জোহানের গলার স্বর ঃ ভালুকবেশী শয়তান ওকে আমি মারব···

ব'লে তার গাদা বন্দুকটা তুলল জোহান।

সঙ্গে সঙ্গে বনজোড়া নৈঃশব্দ্যের বুক চিরে জেগে উঠল স্ত্রীকণ্ঠের আর্তনাদ—ভালুকটির গলা থেকে যেন মেয়েমানুষের গলার স্বর বেরিয়ে এল।

—শুনছেন স্যার ··এ একটা শয়তানী পিশাচী···

ব'লে বন্দুকের ঘোড়া টিপতে যাচ্ছে জোহান, এমন সময় বিদ্যুৎবেগে জোহানের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভালুকটা এবং বন্দুকসুদ্ধ তাকে জড়িয়ে ধরল তার বুকের মধ্যে।

পরমুহূর্তে জোহানের গলা থেকে বুকফাটা আর্তনাদ বেরিয়ে আসে। তার ভয়ার্ত চিৎকারের জবাব দিল ভালুকটি তার নিষ্পেষণকে নিবিড়তর ক'রে। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল জোহান এবং তার নিশ্চেতন দেহটিকে টেনে নিয়ে চলল ভালুকটি।

ভালুকটির আলিঙ্গন থেকে জোহানকে মুক্ত করার ক্ষমতা আমার নেই। আমার সঙ্গে বন্দুক বা রাইফেল দূরের কথা, পেনসিল কাটা ছুরিও নেই। কাজেই অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না আমার।

জোহানকে নিয়ে ভালুকটি লতাঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হ'য়ে যেতেই আমি যেন সম্বিৎ ফিরে পাই এবং জোহানকে উদ্ধার করার জন্য কী করা যায় তা ভাবতে শুরু করি।

নিরস্ত্র আমার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়; অতএব পাহাড়িয়াদের শরণাপন্ন হওয়ার কথা মনে হল। ঠিক কোথায় ওদের আস্তানা এই অস্ফুট জ্যোৎস্নায় তার ঠাহর পাওয়া কঠিন, হরিণদের পায়ে পায়ে তৈরী যে পথ দিয়ে জোহানের সঙ্গে এসেছি, ছায়াচ্ছন্ন বনের মধ্যে তার কোন চিহ্নই পাই না খুঁজে। দিশেহারার মত ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে চড়াই বেয়ে উঠতে থাকি। চড়াইয়ের শেষে একেবারে পাহাড়ের চূড়ায় আমাদের ডাকবাংলো—বনের মধ্যে পথ হারালেও ডাকবাংলোটিতে পৌঁছে যাব ঠিকই।

পৌঁছে গেলামও। তখন রাত শেষ হয়ে এসেছে, পশ্চিম আকাশে পাণ্ডুর হ'য়ে ঢলে পড়েছে কৃষ্ণপক্ষের আধখানা চাঁদ এবং আকাশে

কালিমালিপ্ত বনের মাথায় জ্বলজ্বল করছে শুকতারা। ডাকবাংলোর বারান্দায় একটি বেতের চেয়ারে আমার ক্লান্ত অবসন্ন দেহটিকে এলিয়ে দিতে চলেছি, এমন সময় আমার সামনে টলতে টলতে এসে দাঁড়াল জোহান।

জোহানকে দেখেই চমকে উঠলাম। কী কৌশলে ভালুকের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে ভেবে না পেয়ে ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকি তার মুখের দিকে।

আমার নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকা জোহানের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটিয়ে তুলল। সে বলল, ও রকম অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে আছেন কেন স্যার! বেঁচে আছি ও পুরোপুরি অক্ষত শরীরেই ফিরে এসেছি।

—ভালুকের খপ্পর থেকে এমনি অক্ষত শরীরে ফিরে এলে কী ক'রে জোহান! আমি অবাক হয়ে বললাম, ভালুকটাকে মেরে ফেলেছ তুমি?

—না স্যার, ওকে পুরোপুরি কাবু ক'রে ফেলেছি।

—কী ক'রে?

—যেমন ক'রে বৌকে কাবু করি—প্রায় অচেতন হ'য়ে প'ড়ে আছে গুহার মধ্যে···

চমকে উঠলাম আমি। জোহানের মুখের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বললাম, একটা মাদী-ভালুককে তুমি···তুমি···

—ভালুক নয় স্যার, মেয়েমানুষ, মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে জোহান বললে, গুহার মধ্যে যখন আমার জ্ঞান ফিরল, যখন ভালুকের চামড়ার খোলস থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল তার সমস্ত শরীর দিয়ে! কী আর বলব স্যার, এমন ভরপুর যৌবন অন্য কোন মেয়েমানুষের শরীরে দেখিনি কখনো। প্রথমে ভয় পেয়ে গেলেও আমার শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে যুঝলাম ওর সঙ্গে···

—কিন্তু ঐ গুহার মধ্যে ভালুকের ছদ্মবেশ নিয়ে বাস করছে কেন মেয়েটা?

—কেন আবার, আত্মরক্ষার জন্য। এ অঞ্চলের আদিবাসীরা সকলেই মনে করে ও একটা ডাইনী, ওকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল ওরা। পালিয়ে এই দলমা পাহাড়ের ভালুকের গুহায় লুকিয়ে থেকে নিজের জান বাঁচিয়েছে সে। ভালুক নাচানো ছিল ওর বাবার পেশা, তার কাছ থেকে পেয়েছিল মাথাসুদ্ধ ভালুকের সম্পূর্ণ দেহের খোলস। তাই প'রে ভালুকের নিখুঁত ছদ্মবেশ নিয়েছে সে আর ধোঁকা দিচ্ছে এখানকার ভালুক ও পাহাড়িয়াদের।

—কিন্তু গুহার মধ্যে লুকিয়ে থাকলেই কি প্রাণ বাঁচে, বেঁচে থাকার জন্য খাবার চাই···

—তা ও পেয়ে যাচ্ছে। মহুয়া-ফুল ও ফল ছাড়াও কন্দ, জাম, কুল, আমলকী, কলা, আম ইত্যাদি কুড়িয়ে আনে, তাছাড়া পাহাড়িয়াদের খেত থেকে চুরি ক'রে আনা ভুট্টা ও কোদো ঘাসের ডাল। মাঝে মাঝে খরগোস ও ছোটখাটো হরিণ মেরে তার মাংস আগুনে ঝলসে নেয়।

—জানলেন স্যার, আমার মত শুভ্রজ্যোতিকেও তার গুহার মধ্যে ধরে নিয়ে গিয়েছিল ঐ ভালুক-মেয়েটা। জোহান ব'লে চলে, আমার কাছে শুভ্রজ্যোতির ছবিটা দেখেই সে চিনতে পারে। সে নাকি তাকে সাহায্য করেছিল এই দলমা-পাহাড় থেকে পালিয়ে যেতে···

—কোথায় গিয়েছে সে? আমি প্রশ্ন করলাম।

—ধাদকার দিকে। পাহাড়িয়াদের দৃষ্টি এড়িয়ে একদিন রাত্রে সে নিজে তাকে এগিয়ে দিয়েছিল অনেকদূর পর্যন্ত।

দলমার পর ধাদকা। ভ্যালেনটাইন বল্-এর ভ্রমণ বৃত্তান্তে চিহ্নিত ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে গিয়েছে সে ওখানে। বিপর্যয়ের মধ্যেও তার পরিকল্পিত ভ্রমণসূচী থেকে বিচ্যুত হয়নি।

—তা হ'লে চল এখনই রওনা হই আমরা। আমি বললাম, আর দেরি করা উচিত নয়।

—নিশ্চয়ই না, জোহান বললে, দেরি করলে ঐ ভালুক মেয়েটি খুঁজবে—রক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘিনীর মতই খুঁজতে বেরুবে আমাকে···

৫

নিবিড় বনকে চিরে ফেলেছে লাল কাঁকরে ছাওয়া বনবিভাগের সড়ক—ঘন সবুজের বুক ফুঁড়ে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্তের রেখার মত প্রসারিত হয়েছে অদূরবর্তী ব্যাসল্টের পাহাড়ের দিকে। এই "রাঙামাটির পথ" যতই আমাদের মন ভোলাক, আমাদের আর জীপগাড়ির চলাকে রমণীয় ক'রে তোলে না। কারণ, পথ স্থানীয় ভূ-প্রকৃতির মতই রুক্ষ। এই বন্ধুর পথের সঙ্গে আমাদের জীপগাড়ির বন্ধুত্ব ঘটে না কোথাও—আগাগোড়া যান্ত্রিক আর্তনাদ তুলে এই পথের সঙ্গে তার অসহযোগিতা ঘোষণা করতে করতে সে এগিয়ে যায়।

বন পেরিয়ে হঠাৎ একটি খোয়াইয়ের মধ্যে এসে পড়লাম। খোয়াই মানে রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

…"ঊর্মিল লাল কাঁকরের নিস্তব্ধ তোলপাড়,
মাঝে মাঝে মরচে ধরা কালো মাটি
মহিষাসুরের মুণ্ড যেন…"

খোয়াইয়ের ঢিবিওয়ালা খাদগুলির মাঝখানে একটি পাহাড়ী নালা চোখে পড়ল। নালাটি কিছুদূরে গিয়ে একটি নদীর আকার নিয়েছে। প্রায় নির্জলা এই নদীর বাঁকে বাঁকে ক্ষীণ জলের ধারা চোখে পড়ে। শুষ্ক নির্জীব বালুর ক্ষেত্রের মধ্যে এইসব প্রস্রবণ যেন বিস্ময়কর ব্যতিক্রম।

ভ্যালেনটাইন বল্-এর ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে এই নদীর বর্ণনা আছে। এই নদীর বাঁকে বাঁকে বালি ধুয়ে সোনা আহরণের তৎপরতা দেখেছিলেন তিনি স্থানীয় আদিবাসীদের মধ্যে। 'দোহরা', 'কোল', ও 'মুণ্ডা' সম্প্রদায়ের মানুষদের রক্তের মধ্যে ছিল এই সোনা সংগ্রহের নেশা। এই নদী শুধু নয়, পুরুলিয়া, সিংভূম ও রাঁচি জেলার বিভিন্ন

নদী নালার বালির মধ্যে প্রচ্ছন্ন স্বর্ণরেণুকে চিনে নিয়েছিল তারা। এই বালি ধুয়ে সূক্ষ্মতম সোনার কণাকে আহরণ করত তারা আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে। বালির মধ্যে প্রচ্ছন্ন বিরল স্বর্ণরেণুকে কী ক'রে তারা চিনত এবং কী কৌশলে তাকে উদ্ধার করত এ প্রশ্ন তাঁর মনকে নাড়া দিয়েছিল। ধাদকার কাছে ঐ পাহাড়ী নদীর বালির মধ্যে সে-সব জায়গায় যেতেন তিনি এবং জল দিয়ে ধুয়ে যারা সোনা আহরণে তৎপর হয়ে উঠেছিল তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতেন।

জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে অবশ্য কোন ফল হত না, কারণ তারা কোন কথাই বলত না এবং তাঁর প্রশ্নের কোন জবাবই দিতে চাইত না। তিনি তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই তারা বালি ধোয়া বন্ধ ক'রে দিয়ে পালিয়ে যেত। তাই তিনি শেষ পর্যন্ত ঠিক করলেন যে আড়াল থেকে, অর্থাৎ লতাঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থেকে লক্ষ্য করবেন তাদের।

ঐ নদীর একটি বাঁকের ওপরে সোনা-আহরণের জন্য বালি ধুয়ে দিত এক জোড়া 'দাহরা' যুবক ও যুবতী। বেল্-সাহেব তাদের কাছাকাছি একটি চিহোর-লতার ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে নজর রাখলেন এবং মন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করলেন তাদের ক্রিয়াকলাপ—।

বিশেষ করে নদীর এই বাঁকটিকে তারা বেছে নিয়েছিল কেন তা বোঝার চেষ্টা করতে গিয়ে বল্-সাহেবের মনে হল, জলস্রোতের ক্রিয়ায় হয়তো ওখানে বালির মধ্যে সোনার সমাহরণ (concentration) ঘটেছে। কিন্তু বালির মধ্যে সোনা এমনি সূক্ষ্মভাবে বিরাজ করছে যে তার কণামাত্র জৌলুসও প্রকাশ পায় না। তথাপি বালির মধ্যে চাপা পড়া সোনার এই সমাহরণ ওরা বুঝতে পারে। হয়তো তাদের অন্তর্দৃষ্টি দিয়েই বুঝতে পারে। কারণ চোখের দৃষ্টি দিয়ে কিছু বোঝার উপায় নেই।

কাঠের একটি চৌকো পাত্রে নদীর বাঁকের মুখে জমা বালির খানিকটা তুলে নেয় ওরা। পরে বল্-সাহেব জেনেছিলেন, পাত্রটির নাম হল "ফালা"। বালির সঙ্গে জল মিশিয়ে পাত্রটিকে দুহাত দিয়ে

ঘোরায় ওরা। সঙ্গে সঙ্গে জলের মধ্যে আবর্ত জাগে এবং বালির হালকা দানাগুলি বেরিয়ে যায়। প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে দেখা যায়, বালির হালকা শুভ্র কণাগুলি অপসৃত হয়ে অবশিষ্ট রয়েছে কালো পাথরের দানা। এই জমাট কালো প্রস্তরকণার মধ্যে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত আত্মপ্রকাশ করে সোনার জৌলুস।

দু তিনটি সোনার দানা পেয়েই খুশি হ'য়ে চলে যায় তারা তাদের গ্রামে। বল্ সাহেব খবর নিয়ে জানেন যে এই সোনার দানাযুক্ত কালো বালি বিক্রি ক'রে তারা আনা দুয়েকের মত পায় স্বর্ণকারদের কাছ থেকে। তাতেই ওরা খুশি। সোনা আহরণ এদের জীবিকা, বংশানুক্রমে বালি ধুয়ে সোনা বের করছে এরা—এদের রক্তের মধ্যে নেশার মতো মিশে আছে সোনা-সংগ্রহের ঝোঁক, কিন্তু সোনার প্রতি বিন্দুমাত্রও লোভ নেই তাদের।

সোনার প্রতি আসক্তিবিহীন এই সব নির্লোভ স্বর্ণসন্ধানীদের বিষয়ে আরও কিছু জানবার আগ্রহ ছিল বল্-সাহেবের, কিন্তু স্বর্ণ-সন্ধানীদের সম্পর্কে সন্ধানপর্ব মাঝপথেই থামিয়ে দিতে বাধ্য হলেন তিনি বাঘের উপদ্রবের দরুন।

একজোড়া বাঘ হঠাৎ তাদের বনের সীমা পেরিয়ে লোকালয়ে এসে গরু বাছুর ধরে খেতে শুরু করে। গ্রামবাসীদের মধ্যে এমনি আতঙ্ক সৃষ্টি হয় যে তারা সোনার জন্য বালি ধোয়ার কাজ একেবারে বন্ধ করে দেয়।

ধাদকার নরনারীদের অনুরোধে বল্-সাহেব সোনা ও সোনা যারা খুঁজছে তাদের ছেড়ে দিয়ে এই বাঘদু'টির দিকে মন দিলেন। তাঁর আদেশে স্থানীয় সাঁওতাল ও ভূমিজরা বাঘের আস্তানাকে ঘিরে ফেলল। বাঘ দু'টি তাদের আস্তানা থেকে বেরিয়ে এসে বল্-সাহেবের মুখোমুখি হল। তাদের মধ্যে একটি বল্-সাহেবের গুলিতে ধরাশায়ী হলেও অন্যটি পালিয়ে গেল সাঁওতাল ও ভূমিজদের বেষ্টনী ভেদ ক'রে।

এরপর পলাতক বাঘটিকে অনুসরণ ক'রে বল্-সাহেব কাঁটাগোড়ায়

গিয়ে পৌঁছলেন। কাঁটাগোড়া গ্রামটি চারপাশের বনের সঙ্গে মিলেমিশে এমনি একাকার হ'য়ে গিয়েছে যে গ্রামটিকে বন থেকে তফাৎ করা যায় না। এখানে পৌঁছেই তিনি শুনলেন যে বাঘটি গ্রামের বাইরে ছুটো গরু মেরেছে। গরু দু'টির কাছাকাছি গাছে মাচান বেঁধে সন্ধ্যার পর তার ওপর গিয়ে বসলেন বল্-সাহেব। তিনি আশা করলেন যে গভীর রাত্রে বাঘটি গরুর মৃতদেহ দু'টির কাছে ফিরে আসবে তাদের মাংস খাবার জন্য।

জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলো বনের গাছপালাগুলির মাঝখানকার অন্ধকারকে ফিকে ক'রে দিয়ে বনময় যেন একটা রুদ্ধশ্বাস আতঙ্ককে পরিস্ফুট ক'রে তুলেছে। অতলস্পর্শী স্তব্ধতা যেন এই আতঙ্ককে আরও উগ্র ক'রে তোলে। যে কোনও মুহূর্তে যেন এই স্তব্ধতার বক্ষ ভেদ ক'রে আত্মপ্রকাশ করবে বাঘটির হিংস্রতা।

কিন্তু সারা রাত কেটে যায় তাঁর এই হৃৎকম্পতাড়িত প্রতীক্ষায়, বাঘটি আর ফিরে আসে না। পরদিন সকালে বল্-সাহেব খবর পেলেন যে প্রায় দশ মাইল দূরে আর একটি মোষকে মেরে তার নৈশভোজ সম্পন্ন করেছে বাঘটি।

বাঘকে অনুসরণ করতে গিয়ে অসম্পূর্ণ থাকে বল্-সাহেবের সোনা সম্বন্ধে সংবাদ-সংগ্রহ। ধাদকা অঞ্চল ছেড়ে তিনি চলে যান ঘাটশিলার দিকে—তারপর প্রবেশ করেন উড়িষ্যার অরণ্য অঞ্চলে।

যদিও আমি ধাদকাতে শুভ্রজ্যোতির সন্ধানে এসেছি, তথাপি বল্-সাহেবের অসম্পূর্ণ সন্ধানপর্বকে সম্পূর্ণ করার সাধ হল আমার। ওখানে পৌঁছেই শুভ্রজ্যোতির সঙ্গে সোনার খবরও নিলাম। গ্রামের মুখিয়াকে ডেকে শুভ্রজ্যোতির ছবিটা দেখিয়ে বললাম, এর খোঁজ চাই, এর সঙ্গে সোনার খবরও চাই।

শুভ্রজ্যোতি ও সোনা উভয় ব্যাপারেই মুখিয়ার প্রচণ্ড আক্রোশ দেখতে পেলাম। মুখ-চোখ লাল ক'রে কটমটিয়ে তাকাল সে আমার মুখের পানে। তারপর ঝাঁজালো স্বরে বলে উঠল, সোনা আমাদের খুব পবিত্র জিনিস, তার সম্বন্ধে বিদেশীয়দের কাছে কিছুই বলতে

পারব না। ঐ শয়তানটা—যার ছবি তুমি দেখাচ্ছ, সেই বদমাইসটা সোনা খুঁজতেই এসেছিল—জানতে চেয়েছিল এখানকার সোনার খবর। জানো, সোনা খোঁজার নাম ক'রে শয়তানটা সোনার চেয়ে দামী জিনিস চুরি ক'রে নিয়ে পালিয়েছে। কিন্তু পালিয়ে আর কতদূর যাবে। ঠিক ধ'রে ফেলব আর শাস্তি দেব···

—কী শাস্তি দেবে? ভয়ে ভয়ে আমি প্রশ্ন করলাম।

—হাত-পা কেটে ফেলে আগুনে পুড়িয়ে মারব।

সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠল আমার সর্বাঙ্গ।

হাজার প্রশ্ন ক'রেও শুভ্রজ্যোতি কী চুরি করেছে জানতে পারলাম না। শুধু এইটুকু বুঝলাম, সে যা চুরি করেছে এখানকার আদিবাসীদের চোখে তার চেয়ে মূল্যবান বস্তু আর কিছু নেই এবং এই চুরির চেয়ে গর্হিত কাজ আর কিছু কল্পনাও করতে পারে না তারা।

মুখিয়ার কথাবার্তা ও হাবভাবে রীতিমত ভয় পেয়ে যাই আমি। মনের মধ্যে প্রচণ্ড আতঙ্ক ও উদ্বেগের তাড়নায় শুভ্রজ্যোতিকে সত্বর খুঁজে বের ক'রে তাকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠি।

৬

কিন্তু শুভ্রজ্যোতির গতিবিধির কোন হদিসই পাই না এখানে। সে যে এখানে এসেছিল তার একমাত্র প্রমাণ মুখিয়ার ঐ উক্তি। কোথায় ছিল এখানে এবং কতদিন ছিল তার কিছুই বুঝতে পারি না। ধাদকার বনবিভাগের যে বিশ্রামগৃহে আমি আশ্রয় নিই, তার চৌকিদার তার সম্বন্ধে কিছুই জানে না। চৌকিদারের এই অজ্ঞতা থেকে বোঝা যায় যে সে তাকে চোখেও দেখেনি।

চোখে না দেখলেও তার সম্বন্ধে জনশ্রুতি কানে এসেছে তার। সে শুনেছে, একটি সুন্দরমত বাঙ্গালী ছেলে এখানে এসেছিল, এসে লিপ্ত হ'য়ে পড়েছিল একটি জঘন্য অপরাধে। তারপর পালিয়ে গিয়েছিল। এছাড়া কিছুই জানে না সে, তার কোন খবরই রাখে না সে।

—আমি তো এখানকার লোক নই হুজুর, চৌকিদার বললে, চাকরির দায়ে রঘুনাথপুর থেকে এসেছি এখানে। এখানকার লোকেরা তো তাদের আপনজন ব'লে মনে করতে পারে না আমাকে, কাজেই এ ধরনের কেলেঙ্কারির কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করেনি আমার কাছে।

জোহান বললে, খবর জানতে হলে এখানকার লোকদের বিশেষ ক'রে মেয়েদের সঙ্গে ভাব-সাব করে নিতে হবে স্যার।

—বিশেষ ক'রে মেয়েদের সঙ্গে কেন? আমি অবাক হ'য়ে বললাম।

—আদিবাসী পুরুষরা বড়ো একগুঁয়ে গোঁয়াড় গোছের হ'য়ে থাকে স্যার, সরলতা মায়া দয়া এদের মেয়েদের মধ্যেই আছে কিছুটা, শুভ্রজ্যোতিবাবু যত জঘন্য অপরাধ করুন, তাঁর সম্বন্ধে কিছুটা নরমভাব হয়তো মেয়েদের মধ্যেই আছে। কাজেই তাঁর খবর পেতে হলে ওদের মধ্যেই খোঁজ খবর নিতে হবে।

ইতিমধ্যে ধাদকার পাহাড়ী নদীনালাগুলির মধ্যে আমিও খুঁজে বেড়াই। নদীনালার বালি থেকে যারা সোনা সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত আছে তারা হয়তো তার সম্বন্ধে জানে—ওদের জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে তার খবর সম্ভবত পেয়ে যেতে পারি।

কিন্তু সব কটি নদী-নালা ঘুরেও সোনা আহরণের কোন তৎপরতাই দেখতে পাই না। মনে হয় যেন সোনা সংগ্রহের কাজ বন্ধ ক'রে দিয়েছে এরা।

মুখিয়া বলেছিল যে, শুভ্রজ্যোতি এখানকার সোনা সম্বন্ধে আগ্রহ দেখিয়েছিল। তখন নিশ্চয়ই চলত এখানে সোনা সংগ্রহের কাজ। কিন্তু একবছরের মধ্যেই তা বন্ধ ক'রে দিয়েছে কেন বুঝতে পারছি না। বালির মধ্যে সোনা কী ফুরিয়ে গিয়েছে?

বল্-সাহেবের বর্ণিত নদীটির ধারে এসে একদিন সেই বিশেষ বাঁকটির সন্ধান নিলাম যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি বালি ধুয়ে সোনা বের করার কৌশল আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। নদীর দুপাশে বুনো জাম ও অর্জুন গাছের ফাঁকে কুরচির ঘন ঝোপ বল্-সাহেবের বর্ণনার সঙ্গে চমৎকার মিলে যাচ্ছে। একই নদী, একই গাছপালার সমাবেশ, নেই শুধু স্বর্ণান্বেষীর দল।

স্বর্ণান্বেষী ছাড়া জলান্বেষীরাও আসত এখানে। কয়েকটি প্রস্রবণ থেকে উদ্গত জলের ধারা নদীটাকে প্রখর গ্রীষ্মের মধ্যেও জলসিক্ত করে রাখত। যে সব মানুষ এখানকার বনের মধ্যে বাস করে, এই নদীর জলই মেটাত তাদের তৃষ্ণা। কিন্তু তাদেরও দেখা যাচ্ছে না। নদীর দুই তীরে যতদূর দৃষ্টি চলে কোথাও কেউই নেই।

ব্যাপারটা খুবই বিস্ময়কর! পুরুলিয়া জেলার নির্জলা অঞ্চলকে খরা-পীড়িত এলাকা ব'লে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখন এই মার্চ মাসের শেষে যখন জলের অধিকাংশ উৎস শুকিয়ে যেতে বসেছে, তখন জলের স্বতঃ-উৎসারিত সহজ উৎসকে সকলের এড়িয়ে যাওয়ার চেয়ে আশ্চর্য ঘটনা কী আর কিছু আছে!

এই নদী কিছু দূরে আর একটি নদীর সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। এই দুই নদীর সংযোগে সৃষ্টি হয়েছে গুরমা নদী। চৈত্র মাসের শুষ্কতার শোষণের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ না ক'রে এই নদীটিও সুজলা হওয়ার দাবী রাখছে।

নদীতে এত জল, তথাপি কোন গ্রাম্য বধূ "জলকে" আসে নি এখানে। নির্জলা অঞ্চলে জলের প্রতি এমনি উপেক্ষা বুদ্ধির অতীত, বিস্ময়কর ব্যাপার।

নদীর ধারে দাঁড়িয়ে এই বুদ্ধির অতীত বিষয়ের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা খুঁজছি, এমন সময় আমার সামনে এসে দাঁড়াল জোহান। সে আমার মুখের পানে তাকিয়ে মৃদু-মন্দ হাসতে হাসতে বলল, সোনা ও জল দু'টিতে এখানকার লোকদের কী রকম অরুচি দেখেছেন স্যার!

—দেখছি। আমি বললাম, দেখে হতবুদ্ধি হ'য়ে পড়েছি। এর কোন ব্যাখ্যা কী পার দিতে?

—পারি, কিন্তু সেটা আমার ব্যাখ্যা নয়, গাঁয়ের মেয়েদের। তাদের কাছে শুনেছি, এই গুরমা নদী ও তার শাখাপ্রশাখার ওপরে ভূত ভর করেছে। তাই তারা এদিকে ঘেঁষছে না, নদীর জল ও সোনা দু'টি বস্তুকেই বর্জন করেছে।

—কবে থেকে শুরু হয়েছে ভূতের উপদ্রব? মুখিয়ার কথা শুনে তো মনে হয় একবছর আগেও নদীর বালি থেকে সোনা বের করা হত।

—এক বছর আগে যখন শুভ্রজ্যোতিবাবু এলেন, তখন শুরু হয়নি, শুরু হয়েছে শুভ্রজ্যোতিবাবু চলে যাওয়ার পর থেকে। তার মানে, শুভ্রজ্যোতিবাবু গেলেন, আর ভূতেরা এল। জানেন নিশ্চয়ই, আমরা আদিবাসরা আর কিছুকে ভয় না পেলেও ভূতকে বড় ভয় পাই। কাজেই ভূতের উপদ্রব শুরু হতেই এই সব নদীনালা ফাঁকা হয়ে গিয়েছে, দিনমানেও ঐদিক ঘেঁষে না কেউ।

—শুভ্রজ্যোতির এখান থেকে চ'লে যাওয়ার সঙ্গে ভূতের উপদ্রবের কোন সম্পর্ক নেই তো?

—থাকতে পারে, কিন্তু সে সম্পর্কে এখানকার কারুর কাছ থেকে কিছু জানার উপায় নেই। ভেবেছিলাম, এখানকার মেয়েদের কাছ থেকে শুভ্রজ্যোতি সম্বন্ধে কিছু জানতে পারব, কিন্তু ভয়ে কেউই পারছে না মুখ খুলতে।

—তা হলে উপায়? কাতর স্বরে ব'লে উঠলাম আমি।

—একমাত্র উপায় ভূতের কাছ থেকে সব জেনে নেওয়া। গম্ভীর মুখে বললে জোহান, তাই এইসব পাহাড়ী নদী-নালার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি···

আমি অবাক হয়ে জোহানের মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, ভূতের কাছ থেকে শুভ্রজ্যোতির খবর জেনে নেবে—তোমার কী মাথা খারাপ হয়েছে জোহান?

—মাথা আমার ঠিকই আছে স্যার, আসুন না আমার সঙ্গে, ভূতের সঙ্গে আপনারও মোলাকাত করিয়ে দেব···

গুরমা নদীর ধারাপথ বেয়ে সেদিন সারাদিন ঘোরাঘুরি করলাম আমরা। ধাদকা থেকে কিছু দূরে নদীটা গভীর বনের ভেতরে ঢুকেছে। চারপাশের বনের তুলনায় অনেক বেশি তার ঘনত্ব। তার মধ্যে ঢুকে মনে হল এতক্ষণ যেন বনের বাইরের খোলস নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি, খাঁটি বনের ভেতরের মহলে এই প্রথম প্রবেশ করছি। উঁচু খাড়া শাল, কেঁদ, পিয়াশাল প্রভৃতি বনস্পতি শ্রেণীর সন্নিবেশ দিনের আলোকে ঢুকতে দেয় নি। সারাদিনের মধ্যে এখানে সূর্যের আলো ঢোকে কিনা সন্দেহ, সুতরাং বনভূমি কিছুটা স্যাঁৎসেঁতে—বড় বড় গাছের নীচে ও লতাঝোপের জঙ্গলেও বেশ অন্ধকার।

এ বনের মধ্যে যত ঢুকি বনের ঘনত্ব তত বেড়ে যায়। পায়ে-চলা যে পথ ধ'রে হাঁটছিলাম তা ক্রমশঃ ঘন ঝোপের আচ্ছাদনের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। পথ নেই, তবু এগিয়ে যাচ্ছে জোহান, অনেক কষ্টে তাকে অনুসরণ করতে থাকি আমি।

সামনে ঘন সন্নিবিষ্ট বনপানের ঝোপে উঁচু চিমনীর মত শালগাছ-

গুলোর মাঝখানকার শূন্যস্থান পূর্ণ ক'রে যেন একটা দুর্ভেদ্য পাঁচিল রচনা করেছে। আর এগিয়ে যাওয়া যাবে না।

কিন্তু সামনের এই বাধাকে বাধা বলে মানতে রাজি নয় জোহান। সে তার কোমর থেকে টাঙি বের করে লতাঝোপের মধ্যে পথ তৈরি করতে শুরু করে।

—ব্যাপার কী জোহান? আমি অবাক হ'য়ে বললাম, এই দুর্ভেদ্য বনের মধ্যে পথ তৈরি ক'রে কোথায় যেতে চাও? এর মধ্যে কি তোমার ঐ ভূতটা ঢুকে ব'সে আছে মনে কর?

—ঠাট্টা করবেন না স্যার। জোহান বললে, আর পাঁচজন আদিবাসীর মত আমিও ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। ভূত আছে ও থাকবে, যে কোনও জায়গা, তা সে যত দুর্গম হোক, তার কাছে অগম্য নয়।

—কোন জায়গাই যখন তার কাছে অগম্য নয়, তখন এমন একটা দুর্গম জায়গা সে বেছে নেবে কেন বলতে পার?

—তা বলতে পারি না, তবে সে যে এখানেই আছে সে বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত, তার গায়ের গন্ধ পাচ্ছি কিনা···

—ভূতের গায়ের গন্ধ পাচ্ছ! আমি বিস্ফারিত চোখে তাকালাম জোহানের দিকে। —সে আবার কী রকম?

—এখানে দাঁড়িয়ে জোরে নিঃশ্বাস নিন, গন্ধটা আপনার নাকেও এসে পৌঁছবে···

জোরে নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে একটা মনমাতানো গন্ধ নাকে এল। কিসের গন্ধ ঠিক বুঝতে পারি না—হয়তো কোন বুনো ফুল, কিংবা গাছের গুঁড়ি থেকে বেরিয়ে আসা রস। জোহান আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে বলল, যা ভাবছেন তা নয়—এ হল ভূত বা পেত্নীর গায়ের গন্ধ। নিকটেই আছে ওরা, সামনের ঐ লতা-ঝোপটা সাফ করলেই পৌঁছে যাব ওদের কাছাকাছি।

ব'লে ঘনসন্নিবিষ্ট আতগুী লতার ঝোপের ওপরে আঘাতের পর আঘাত হানে জোহান তার টাঙি দিয়ে। হঠাৎ প্রচণ্ড আলোড়ন

জাগল লতাঝোপের মধ্যে, লতাপাতার জমাট সবুজ স্তরটির মধ্যে শুরু হল তোলপাড়----তার বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে এল একটা প্রকাণ্ড ভালুক। এসে থমকে দাঁড়াল আমাদের সামনে। অত বড়ো একটা ভালুককে এত কাছের থেকে দেখার অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম। শুনেছি, ভালুকের চেয়ে হিংস্র জানোয়ার পৃথিবীতে আর নেই। এত কাছে এসে দাঁড়িয়েছে----এর পরই হয়তো আক্রমণ করবে। কিন্তু তবু যাকে বলে ভয়ে দিশেহারা হওয়া, তা আমরা হই না----আমাদের ভয়কে ছাপিয়ে যায় বন্য ভালুকের সান্নিধ্য লাভের দুর্লভ অভিজ্ঞতার রোমাঞ্চ। আমরা দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়ি চিত্রার্পিতের মত, একদৃষ্টে চেয়ে থাকি তার দিকে।

রুদ্ধশ্বাস কয়েকটি মুহূর্ত। তারপর ঘটল এক অদ্ভুত ব্যাপার। ভালুকটি পালিয়ে গেল ঊর্দ্ধশ্বাসে। মানুষ সম্পর্কে ভালুকের ভয়ের সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। বুঝলাম যে, ভালুকের চোখে মানুষ প্রচণ্ড রকম হিংস্র একটা প্রাণী।

ভালুকের ভয় দেখে অহঙ্কৃত বোধ অবশ্য করি না, কারণ ভয় পাওয়া ভালুকটি এরপর হয়তো আত্মরক্ষার তাগিদে আমাদের ওপর হামলা করে বসবে। কিন্তু জোহান নির্বিকার, সে তার টাঙি দিয়ে আঘাতের পর আঘাত হেনে লতাঝোপের মধ্যে পথ তৈরি করতে থাকে।

অবশেষে লতাঝোপ পেরিয়ে ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম আমরা। অদূরে একটি ছোট কুঁড়েঘর। তাতে লোকজন কেউ আছে ব'লে মনে হল না। ঘরের সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে গুরমা নদী।

জোহান ঘরটির দিকে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বললে, মনে হচ্ছে এখানেই আছে ওরা···

—কিন্তু ওখানে কেউ আছে ব'লে তো মনে হচ্ছে না। আমি বললাম।

—কেউ নেই বলেই ওরা আছে। আসুন আমার সঙ্গে।

কেউ নেই ব'লে যাদের থাকার কথা বললে জোহান, তারা কারা

এ প্রশ্ন করতে অস্বস্তি বোধ করি আমি। মনে মনে ভয় যে পাইনি তা নয়, কিন্তু জোহানের কাছে তা প্রকাশ করতে লজ্জা পাই। কোন কথা না ব'লে নিঃশব্দে অনুসরণ করি তাকে। কুঁড়েঘরের দরজা খোলাই ছিল। তুজনে ঢুকে পড়ি তার মধ্যে।

ঢুকতেই একটা বীভৎস দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ল। ঘরের মেঝের ওপরে একটি মানুষের কঙ্কালকে জড়িয়ে শুয়ে আছে এক বিকটমূর্তি নারী। তার সর্বাঙ্গে আগুনের দাহের চিহ্ন—নাকের জায়গায় গর্ত, চোখতু'টি কোটরগত এবং চুলহীন মাথায় থকথক করছে ঘা। আমাদের তুজনেরই গলা থেকে ভয়সূচক আর্তনাদের শব্দ বেরিয়ে আসে।

সঙ্গে সঙ্গে কঙ্কালটিকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল স্ত্রীলোকটি এবং তাকাল আমাদের দিকে। তার কোটরগত চোখতু'টি জ্বলন্ত অঙ্গারের মত ঝলসে ওঠে। অস্ফুট কম্পিত স্বরে জোহান বললে, পেত্নী হুজুর—ওর চোখের দৃষ্টি দিয়ে আমাদের ভস্ম ক'রে ফেলবে...

—ভয় পেয়ো না। স্ত্রীলোকটি শান্তভাবে পরিষ্কার বাংলায় বললে, আমি তোমাদের মতই মানুষ।

—কিন্তু ঐ কঙ্কালটা! জোহান ভয়ে ভয়ে বললে।

—কঙ্কালটা আমার স্বামী। আমার স্বামীকে ওরা পুড়িয়ে মেরেছে, কাজেই তার কঙ্কাল নিয়ে ঘর করছি।

—তোমার স্বামীকে ওরা পুড়িয়ে মেরেছে কেন? আমি প্রশ্ন করলাম।

—পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল আমাকেই। রাত্রে আমি আমাদের ঝুপড়ির মধ্যে ঘুমোচ্ছি, তখন আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল তাতে। সে সময় আমার স্বামী মাছ ধরছিল এই গুর্‌মা নদীতে। আগুন দেখে সে ছুটে আসে—আমাকে টেনে বের ক'রে আনে ঝুপড়ির মধ্য থেকে। তারপর আমাদের জিনিসপত্র বের ক'রে আনার জন্য আবার ঢুকে পড়েছিল জ্বলন্ত ঝুপড়ির মধ্যে। জিনিসপত্র একে একে সব ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দেয়, তারপর নিজেও বেরিয়ে আসে। কিন্তু তখন তার

সর্বাঙ্গে আগুন। তাকে জাপটে ধ'রে তার গায়ের আগুন নেভাবার চেষ্টা করি। কিন্তু তাতে আগুন নেভা দূরের কথা, আমার গায়েও আগুন লাগে। তখন মরিয়া হয়ে তাকে টানতে টানতে নিয়ে যাই নদীর ধারে। নদীর ধারে বালির মধ্যে গড়াগড়ি দিতে আমাদের গায়ের আগুন নেভে। আগুন নেভে, কিন্তু আগুনের জ্বালা সইতে না পেরে ও মারা যায়। এই পোড়া বীভৎস শরীর নিয়ে বেঁচে থাকি আমি। ওকে ছাড়া বেঁচে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব, তাই ওর কঙ্কাল নিয়ে ঘর করি। জানো, এই কঙ্কালের মধ্যে ও বেঁচে আছে··· সব রকম বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করছে আমাকে।

জোহান বললে, আগুনে তো তোমাদের ঝুপড়িটা পুড়ে গিয়েছিল, এই কুঁড়েঘরটা কী তুমি বানিয়েছ?

—না। স্ত্রীলোকটি জবাব দিল, এটা নীলকুঠির সাহেবদের গোমস্তার ঘর। সাহেবদের দালান ভেঙে গিয়েছে, কিন্তু এই ঘরটি রয়ে গিয়েছে। লোকে বলে ভূতের বাড়ি। আমরা দুজনে তো ভূত হয়ে গেছি, তাই এখানে আছি।

—তোমার স্বামী মরে ভূত হ'য়ে গেলেও তুমি ভূত হলে কী করে! জোহান চোখ বড়ো বড়ো ক'রে তাকাল স্ত্রীলোকটির মুখের দিকে: তু-তুমি তো বেঁচে আছ!

—তা আছি। কিন্তু সকলে আমাকে ভূত ব'লে মনে করে— ভয় পায়। তাই তো তারা আসে না এদিকে, বালি ধুয়ে সোনা তোলে না। ভালই হয়েছে, আমি একাই এখান থেকে সোনা তুলি···

—কিন্তু সোনা দিয়ে কী কর তুমি? জোহান প্রশ্ন করল, স্বর্ণকাররা নিশ্চয়ই তোমার কাছে আসতে সাহস পায় না!

—না, তা পায় না। ব'লে স্ত্রীলোকটি হাসল। এই হাসির চেয়ে বীভৎস আর কিছু কখনো দেখিনি আমি। শিউরে ওঠে আমার বুকের ভেতরটা, জোহানের মুখের ভাবে বুঝতে পারি যে সেও ভয় পেয়েছে।

—ওরা আমার কাছে আসে না। স্ত্রীলোকটি ব'লে চলে, আসে নদীর ধারে আমাদের দেবতার থানে। সেখানে একটি পাথরের পাটার ওপরে আমি আমার ধুয়ে বের করা সোনা রেখে দিই, সেই সোনা তুলে নিয়ে ওরা টাকা রেখে যায়। জানলে বাপু, এক পয়সাও ফাঁকি দেয় না—ভূত-পেত্নীকে পয়সা ফাঁকি দিতে ভয় পায় ওরা।

বলে খিল খিল করে হেসে ওঠে স্ত্রীলোকটি।

—ও রকম ক'রে হেসো না তুমি। জোহান ব্যাকুল স্বরে ব'লে ওঠে, তুমি হয়তো জানো না হাসলে কী রকম ভয়ঙ্কর দেখায় তোমায়!

—না হাসলেও কী কম ভয়ঙ্কর দেখায়? হাসতে হাসতেই বললে স্ত্রীলোকটি, নদীর জলে নিজের চেহারা দেখে আমিও কী কম ভয় পাই!

—কিন্তু ওরা তোমাকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল কেন? আমি প্রশ্ন করলাম।

—আমি যে ওদের দুজনকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলাম। একজন সুন্দরমত বাঙ্গালী ছেলে এখানে কী ক'রে আমরা বালি থেকে সোনা বের করি তা শিখতে চেয়েছিল। এ আমরা কাউকে শেখাই না, কাজেই ওকে আমরা তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু যতই ওকে ফিরিয়ে দিই, ও ফিরে ফিরে আসে, ঘুরঘুর করে আমাদের আশে-পাশে। আমাদের মধ্যে সোনা তোলায় সবচেয়ে ওস্তাদ ছিল মানকী। ওর এক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল, বালি দেখেই তার মধ্যে কতটা সোনা আছে তা বুঝতে পারত—'ফাপা'তে বালি ধুয়ে সোনা বেরও করত সে সবচেয়ে বেশি। তা ছাড়া সোনার মতই ছিল ওর চেহারার জৌলুস —এমনটি দেখিনি আমি কোথাও। এই মানকীকে পুরোপুরি বশ ক'রে ফেলল ঐ বাঙ্গালী ছেলেটা।

—কী করে?

—কী করে বুঝতে পারছ না বাবু! মৃদুমন্দ হাসতে থাকে স্ত্রীলোকটি: যেমন ক'রে একজন জোয়ান পুরুষ মানুষ একজন যুবতী কুমারী মেয়েকে বশ করে, ঠিক তেমনি ক'রে। ওর আশ্চর্য ক্ষমতা

ছিল কিন্তু, মানকীকে ও এমনি সুখ দিয়েছিল যা আমরা আমাদের পুরুষদের কাছে কখনোই পাইনি। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আমি দেখেছি, মানকীকে সুখে বেহুঁশ করে ফেলত সে। সে যাই হোক, মানকী ওর কেনা বাঁদির মত হ'য়ে যায়···সোনার সব গোপন খবর ফাঁস ক'রে দেয় ওর কাছে···শিখিয়ে দেয় সব কিছু···

—এই ছবিটা দেখ তো। জোহান বাধা দিয়ে বললে, এই কি সেই বাঙ্গালী বাবু?

বলতে বলতে শুভ্রজ্যোতির ছবিটা বের ক'রে স্ত্রীলোকটির চোখের সামনে মেলে ধরে জোহান।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। স্ত্রীলোকটি উত্তেজিত স্বরে বলে, তোমরা কি ওকে চেন?

—নিশ্চয়ই। জোহান জবাব দিল, ওকে খুঁজতেই এসেছি এখানে।

—ওকে তো এখানে খুঁজে পাবে না। মানকীকে নিয়ে পালিয়েছে সে। না পালালে ওরা মারা পড়ত আমাদের গাঁয়ের লোকদের হাতে। যে জঘন্য অপরাধ করেছিল ওরা, তাতে আমাদের আইন মতো ওদের মেরে ফেলাই উচিত। কিন্তু ওদের দুজনের ভালবাসা এমন একটা সুন্দর জিনিস, যা নষ্ট করার কথা ভাবতেও আমার কষ্ট হয়েছিল। গাঁ-বুড়ো যখন ওদের দুজনকে মেরে ফেলার হুকুম দিলেন, তখন আমার মনে হল যেন একজোড়া টাটকা সুন্দর ফুলকে আমরা উপড়ে তুলে রক্তগঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে চলেছি। তাই আমি সাহায্য করলাম ওদের পালিয়ে যেতে। আমাদের একটা হাতি ছিল, আমার বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলাম। বাবা ছিলেন রসপালের রাজার মাহুত। রাজার রাজত্ব যেতে তাঁর হাতিশালের হাতিগুলোকে তাঁর মাহুতদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন, আমার বাবা পেয়েছিলেন একটা মাদী হাতি। ওটাকে আমার মরদকে বিয়ের যৌতুক হিসেবে দিয়েছিলেন তিনি। মানকী আর এ বাঙ্গালীবাবুটাকে অনেক দূরে আমাদের গাঁয়ের লোকদের নাগালের বাইরে রেখে আসার জন্য

হাতিটাকে দিয়েছিলাম ওদের। কথা ছিল, দূরে কোন এক রেলস্টেশনে ওদের নামিয়ে দিয়ে হাতিটা ফিরে আসবে। কিন্তু হাতিটা ফিরে আসে নি। বোধ হয়, এই হাতির পিঠে চেপে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা। সে যাই হোক, আমাদের হাতি দিয়ে ওদের পালাতে সাহায্য করেছি ব'লে গাঁ-বুড়ো আমাকে পুড়িয়ে মারার হুকুম দিলেন ··

—গাঁয়ের সকলেই জানে আমি ও আমার মরদ আগুনে পুড়ে মরেছি। স্ত্রীলোকটি ব'লে চলে, তাই ওরা মনে করে আমরা ভূত হয়ে আছি এখানে। আমি নিজেও অবশ্য নিজেকে পেত্নী বলেই মনে করি। এই আগুনে-পোড়া ভয়ঙ্কর চেহারা···মরদের কঙ্কাল নিয়ে ঘর করছি।

—ওরা কোন্ দিকে গেছে বলতে পার? ধৈর্য হারিয়ে ব'লে উঠল জোহান।

—গিয়েছে দক্ষিণ দিকে। হাতির পিঠে চেপে দক্ষিণের ঐ পাহাড়ে, আসান-পিয়াশালের বনের মধ্যে ওদের উধাও হয়ে যেতে দেখেছি···
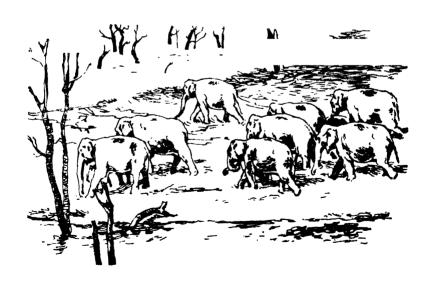
পিয়াশালের বনের মধ্যে হাতির পাল

৭

ভ্যালেনটাইন বল্-এর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে ধাদকার পর সিংভূমের অরণ্যের বর্ণনা আছে। সেখানে বিশেষ একটি পাহাড়ের নীচে হো-দের একটি গ্রামের উল্লেখ আছে—ওখানে দিন কয়েক কাটিয়েছিলেন বল্ সাহেব। শুভ্রজ্যোতি ঐ গ্রামের নামের পাশে লাল পেনসিল দিয়ে "তিন" সংখ্যাটি চিহ্নিত ক'রে রেখেছে, অর্থাৎ ধাদকার পর ওখানে যাওয়ার ইচ্ছে তার।

ধাদকার দক্ষিণের ঐ পাহাড় পেরিয়ে গেলে সুবর্ণরেখা নদীর উপত্যকা। তারও দক্ষিণে সিংভূমের অরণ্যভূমি। হাতির পিঠে চেপে ওদিকে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। এখানকার চেয়েও গভীর ওখানকার বন, মানকীকে নিয়ে ওখানে আত্মগোপন ক'রে থাকতে অসুবিধে হবে না শুভ্রজ্যোতির। ওখানে গেলে ধাদকার মানুষদের চোখে ধুলো দেওয়া ছাড়া তার পরিকল্পনা-অনুযায়ী পর্যটনও হবে। জোহানকে এ কথা বলতেই সে মেনে নিল একথা। বললে, ঠিক বলেছেন স্যার···আমারও মনে হচ্ছে ওখানেই গিয়েছেন শুভ্রজ্যোতি-বাবু...

জীপে করে সোজাসুজি দক্ষিণের পাহাড় পেরিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, কাজেই ঘুরে যেতে হয়। ধাদকা থেকে বোম্বাইয়ের হাইওয়ে। প্রায় সাত আট কিলোমিটার জেলা বোর্ডের সড়ক ধ'রে চ'লে পৌঁছে যাই এই সুপ্রশস্ত রাজপথে। তারপর সোজা পশ্চিমে চলি। শালবন ও আগাছার জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়েছে এই রাস্তা। হালে সম্পূর্ণ হলেও এই বম্বে রোড খুবই পুরোনো পথ। এই পথ দিয়ে বাংলাদেশের তীর্থযাত্রীরা পুরী যেত। শ্রীচৈতন্য তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে এই পথ দিয়েই যাত্রা করেছিলেন শ্রীক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে। সাধু ঈশ্বরপুরীও গিয়েছিলেন এই পথে। এই পীচ-বাঁধানো আধুনিক হাইওয়ের সঙ্গে

মিশে আছে সেই পথ, যে পথের ধুলো বহন করেছে এই সব মহা-পুরুষদের পদচিহ্ন। ভাবতেও রোমাঞ্চ লাগে।

বহেরাগোড়াতে এই ছয় নম্বর জাতীয় সড়ক, অর্থাৎ বম্বে রোড থেকে আর একটি জাতীয় সড়ক বেরিয়েছে। এই সড়কটি ঘাটশিলা, রাঁচি, রামগড়, হাজারিবাগ হ'য়ে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে গিয়ে মিশেছে। বহেরাগোড়াতে পৌঁছে এই দুটি সড়কই ছেড়ে দিয়ে বনবিভাগের রাস্তা ধ'রে বনের মধ্যে প্রবেশ করি।

বন ক্রমশঃ ঘন হ'য়ে ওঠে এবং পাহাড়ের আকার নেয়। অর্থাৎ বনের আচ্ছাদনের আড়ালে পাহাড়ের উত্তুঙ্গতা আত্মপ্রকাশ করে। এই পাহাড় বিচ্ছিন্ন কোন পাহাড় নয় —উত্তর পশ্চিম দিকে একটানা প্রসারিত পাহাড়ের শ্রেণীরই অংশ। এই পাহাড়ের শ্রেণীর টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন অংশগুলো সেরবয়, মোসাবনী, পাথরগড়া, সুরদা, চাপরি, সিদ্ধেশ্বর, রোয়াম, তামাপাহাড়, ভাটিন প্রভৃতি পাহাড়ের আকারে বিরাজ করছে। ঐক্যবদ্ধভাবে তারা একটি সুমসঞ্জস রেখার মত বিস্তৃত হয়েছে। এই ঐক্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভূবিজ্ঞানীরা কোটি কোটি বছর আগেকার ভূসংস্থান নিয়ে আলোচনা করেন। ঐ ঐক্যের মূল সূত্রটি হচ্ছে পাহাড়গুলির মধ্যে প্রচ্ছন্ন তামাবাহী খনিজ 'চ্যালকোপাইরাইটের' সূক্ষ্ম শিরা ও উপশিরা।

এই সব পাহাড়ের আড়ালে প্রচ্ছন্ন চ্যালকোপাইরাইট বল্-সাহেবও দেখতে পেয়েছিলেন। পাহাড়ের পর পাহাড় পরীক্ষা করেছিলেন তিনি তামাযুক্ত এই খনিজ ভাণ্ডারের সন্ধানে। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোরাঘুরি ও খোঁজাখুঁজি করতে করতে পৌঁছেছিলেন তিনি স্বরগচিড়া গ্রামে।

এ অঞ্চলে বহু গ্রামেরই নাম স্বরগচিড়া। বল্-সাহেব যে স্বরগচিড়ায় গিয়ে উপস্থিত হলেন তা বনের মধ্যে কয়েকটি ঝুপড়ির সমাবেশ ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি ভেবেছিলেন, ওখানে ক্যাম্প ক'রে অদূরবর্তী একটি প্রাচীন খনি পরীক্ষা করবেন। কিন্তু ওখানে পৌঁছে খনির দিকে তাঁর নজর পড়ার আগেই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল

গ্রামের তিনজন ডাইনী। গাঁয়ের ওঝা তাদের ডাইনী বলে সনাক্ত করেছে। কাজেই গাঁ-বুড়ো তাদের বোঙ্গার থানে বলি দেবার নির্দেশ দিয়েছেন।

বোঙ্গার থান মানে একটি কুসুম-গাছের তলায় সাজানো কয়েকটি কালো রঙের গোল পাথর। পাথরগুলোর গায়ে সিঁদুর আঁকা, সামনে পুজোর উপকরণ সাজানো। বলির ব্যবস্থাও ক'রে ফেলা হয়েছে। একটি সদ্য শানানো খাঁড়া হাঁড়িকাঠের গায়ে হেলিয়ে রাখা আছে। ডাইনী তিনজনকে বেঁধে রাখা হয়েছে তিনটি জামগাছের সঙ্গে। তাদের দিকে তাকিয়ে বল্-সাহেব চমকে উঠলেন, তিনটি নিরীহ চেহারার যুবতী। বয়স উনিশ থেকে বাইশের মধ্যে। আর আদিবাসী মেয়েদের তুলনায় সুন্দরীও বলা চলে।

ওঝাকে ডেকে এদের তিনজনকে সে ডাইনী ব'লে চিনল কী করে জানতে চাইলেন বল্-সাহেব। ওঝা বললে যে, ওরা তিনজন গাঁয়ের একজন যুবকের রক্ত তিলে তিলে শুষে নিয়েছে—ধীরে ধীরে শুকিয়ে মরেছে যুবকটি।

—একজন মেয়েমানুষ কী কখনো একজন জোয়ান-বয়সী পুরুষের রক্ত শুষে নিতে পারে! অবাক হয়ে বললেন বল্-সাহেব।

—সাধারণ মেয়েমানুষ পারে না, কিন্তু ডাইনী পারে। ওঝা গম্ভীর মুখে বললেন, এরা ডাইনী।

এরপর একটি নৃশংস হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেন বল্-সাহেব। পর পর যুবতী তিনটিকে হাঁড়িকাঠে নিয়ে গিয়ে খাঁড়া দিয়ে বলি দিল চার পাঁচজন ষণ্ডামার্কা সাঁওতাল। রক্তস্রোতে প্লাবিত হয় কুসুম-গাছের তল। বোঙ্গার থান-এর পাথরগুলিকে ঘিরে রক্তের ঘূর্ণি জাগে।

প্রাচীন খনি পরীক্ষা করা আর হয় না বল্-সাহেবের। সমস্ত ভাটিন পাহাড়ের নীলাভ সবুজ রঙ যেন রক্ত-রঙিন হয়ে উঠে। যেদিকে তাকান তিনি, প্রত্যক্ষ করেন রক্তগঙ্গার উন্মত্ত লীলা। পাথরের স্তরগুলোও যেন রক্তাক্ত হ'য়ে ওঠে। পাহাড়, বন, নালার জল সব

যেন যুবতী তিনটির দেহের রক্তে রঞ্জিত। অসুস্থ বোধ করেন বল্-সাহেব। পর পর তিন দিন তাঁর তাঁবু থেকে বেরোতে পারেন না তিনি।

সুস্থ হয়ে উঠে খনির বদলে যুবতী তিনটি সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিতে থাকেন বল্-সাহেব। ওরা সত্যিই ডাইনী ছিল কিনা জানার চেষ্টা করেন। তাঁর দো-ভাষী মারফত জিজ্ঞাসাবাদ করেন গ্রামের লোকদের। অধিকাংশ লোকই তাঁর প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না। দু-একজন কুণ্ঠিত ভাবে যা বলে, তা থেকে বুঝতে পারেন এই তিনটি যুবতীই ঐ যুবকটিকে ভালবেসেছিল। তিনটি পরিপূর্ণযৌবনা নারীর দেহের দাবী মেটাতে গিয়ে যুবকটি অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিল। গ্রামের ওঝা ঝাড়ফুঁক করেও তাকে সুস্থ ক'রে তুলতে পারেন নি।

—মেয়ে তিনটি ঐ ছেলেটাকে ভালোবেসেছিল বলেই ডাইনী হ'য়ে গেল! বল্-সাহেব অবাক হয়ে বললেন গাঁয়ের একটি লোককে।

—হ্যাঁ। লোকটি গম্ভীর মুখে বললে, মেয়েদের ভালবাসা বড় সবনাশা জিনিস—যাকে ভালবাসে, তার শরীর থেকে সব রক্ত শুষে নেয়···

—আর পুরুষদের ভালবাসা?

—তাতে কোন দোষ নেই। পুরুষরা মেয়েদের দেহ ভোগ করলে কারুর কোন ক্ষতি হয় না··

বল্-সাহেবের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে আমরা ঢুকে পড়ি বনাবৃত উপত্যকার মধ্যে। চৈত্রের রোদ যত বাড়ছে, টুপটাপ ক'রে মহুয়া-ফুল ঝ'রে পড়ছে গাছতলায়। বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে ঝাটিফুলের সুগন্ধ। একটি ছোট পাহাড়ী নালা উপত্যকার মাঝখান দিয়ে ব'য়ে চলেছে। নালার দুপাশে বন্য জামগাছের সারি। নালার জলে জামগাছের ছায়া পড়েছে। নালার জলের স্রোতের সঙ্গে তাল রেখে এই ছায়া নড়ে চড়ে, ছড়িয়ে যায়।

উপত্যকার মধ্য দিয়ে খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার পর চড়াই বেয়ে

উঠতে থাকি আমরা। তারপর পৌঁছে যাই কুসুমগাছের তলার বোঙ্গার থানে। স্বরগচিড়া গ্রামটি নিকটেই থাকার কথা। কিন্তু কোথাও কোন গ্রামের চিহ্ন নেই। কুসুমগাছের তলায় বোঙ্গার থান, আশেপাশে শাল-মহুয়ার সমাবেশের মাঝখানে চিহোড় লতার সমাবেশ—সব কিছুরই বিস্ময়কর সাদৃশ্য বল্-সাহেবের বর্ণনার সঙ্গে, কিন্তু গ্রামটিকে কোথাও পাই না খুঁজে। খুব সম্ভব গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছে সেখানকার অধিবাসীরা। মড়কের দরুন পরিত্যক্ত বহু গ্রামের ধ্বংসাবশেষ এ দেশের সর্বত্র দেখা যায়। কিন্তু এখানে সেরকম কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। অর্থাৎ গ্রাম পরিত্যক্ত হওয়া শুধু নয়, নিশ্চিহ্নও হয়েছে। হয়তো কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুন এমন ঘটেছে। পাহাড়ের কোলে অবস্থিত গ্রাম যে-সব প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে লোপ পেতে পারে, তারা হল ধ্বস ও দাবানল, অর্থাৎ বনের মধ্যে জ্বলে ওঠা আগুন। এখানে কী ঘটেছিল তা অবশ্য বোঝার উপায় নেই কোন, কারণ এখানকার ঘন বনের নিবিড় সবুজ আচ্ছাদন তার সব চিহ্নই ঘুচিয়ে দিয়েছে।

খাড়ির দু-পাশে আদিবাসীরা গল্প করতো

স্বরগচিড়া গ্রাম ছেড়ে ওখানকার লোকেরা চলে গেলেও বোঙ্গার থানটি পরিত্যক্ত হয়নি। পাথরে সিঁদুরের দাগ, টাটকা ফুলের স্তূপ এখানে নিত্য পূজার সাক্ষ্য দিচ্ছে। স্বরগচিড়া গ্রামটি না থাকলেও আশেপাশের গ্রাম থেকে আদিবাসীরা এখানে নিশ্চয়ই পুজো দিতে আসে।

বোঙ্গার থানের পাশে একটি পায়ে-চলা শুঁড়ি পথ চোখে পড়ল। পথটি পাহাড়ের চূড়ার দিকে চলে গিয়েছে। হরিণ বা অন্য কোনও বন্য পশুর পায়ে পায়ে এই পথটি তৈরি হয়েছে ব'লে মনে হল না, কারণ পথটি খুবই স্পষ্ট।

এই পথটিকে দেখামাত্র উৎফুল্ল হয়ে উঠল জোহান, সে বললে, এই পথ নিশ্চয়ই কোন গ্রামের দিকে গিয়েছে।

—এই দুর্গম পাহাড়ের ওপরে গ্রাম আছে বলতে চাও? আমি অবাক হয়ে বললাম।

—আমি আর কী বলতে চাইব, সে আপনি নিজের চোখেই দেখতে পাবেন। জোহান বললে, আমরা বনের মানুষরা পাহাড়ের মাথায় ঘর ক'রে থাকতে বড় ভালবাসি।

—সে তো পাহাড়িয়ারা ভালবাসে, কিন্তু তোমরা—মানে মুণ্ডা, কোল, সাঁওতাল—

—আমরা সকলেই ভালবাসি। এ পথ দিয়ে এগিয়ে গেলে নিজের চোখেই দেখতে পাবেন, আসুন স্যার……

ব'লে ঐ 'পথ' ধ'রে হাঁটতে শুরু করল জোহান। তাকে অনুসরণ ক'রে আমিও উঠতে থাকি ঐ দুরন্ত চড়াই বেয়ে। এমন একটা দুর্গম পাহাড়ের ওপরে মানুষের বসবাস করাটা যেন কল্পনাও করা যায় না।

কিছুটা উঠতেই আমি হাঁপাতে থাকি। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় রীতিমত, মনে হয় আমার চারপাশে যেন যথেষ্ট পরিমাণে বাতাস নেই।

আমার কষ্টটা হয়তো আমার মুখে চোখে পরিস্ফুট হ'য়ে থাকবে, কিন্তু তা বোঝার জন্য জোহান ছিল না আমার কাছে। সে ততক্ষণে পাহাড়ের চূড়ার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। তার গমন-পথের দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে যাই। বনের হরিণের মত স্বচ্ছন্দ ও ক্ষিপ্র ওর গতি। পাহাড়ের এই উত্তুঙ্গতা তার কাছে যেন কোন বাধাই সৃষ্টি করেনি। বনের পশুদের সহজাত বন্যতা যেন ওর এগিয়ে চলার ভঙ্গীতে ফুটে উঠেছে।

কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থাকতে আমার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস সহজ হয়ে আসে। ইতিমধ্যে জোহান অদৃশ্য হল একটি পাথরের আড়ালে। হঠাৎ সে চেঁচিয়ে ডাকল আমাকে, স্যার, স্যার···

জোহানের আহ্বানে সাড়া দেবার ক্ষমতা আমার ছিল না, আমি চুপ করে থাকি।

—পাহাড়ের মাথায় একটা ঝুপড়ি আছে স্যার। জোহান চেঁচিয়ে বললে, লোকজন কাউকে অবশ্য দেখতে পাচ্ছি নে—হয়তো শিকারে বেরিয়েছে....

একটি মাত্র ঝুপড়ি মানে ছোট একটি পরিবারের আশ্রয়। অর্থাৎ একটি মাত্র পরিবার ছাড়া স্বরগচিড়ার আর সকলে এই পাহাড় ছেড়ে চলে গিয়েছে।

আমি আবার উঠতে থাকি এই চড়াই বেয়ে। চলতে চলতে হঠাৎ একটা সুদৃশ্য লতাঝোপ চোখে পড়ল। তাতে ফুটে আছে সোনারঙের সুগন্ধি ফুল। দেখে মনে হল কনকচাঁপা। পরে জানলাম তা কনকচাঁপা নয়, চাঁপা জাতীয় আর এক রকম ফুল। এ ফুল নাকি পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে আমদানী। হয়তো অতীতে ওখানকার কেউ এখানে এনে লাগিয়েছিল, এই বন-চাঁপার লতা। সুদূর পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সিংভূমের এই অরণ্য অঞ্চলে এই লতাগাছটি লাগাবার জন্য নিশ্চয়ই সে আসেনি, এসেছিল হয়তো অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে। এই দুর্গম বনের মধ্যে কী কাজে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে কেউ আসতে পারে তা ভাবতে পারি না।

বনচাঁপার ঝোপ ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে যেতেই একটা পাথরের স্তূপ ও তার সামনে একটা সুড়ঙ্গের মুখ দেখতে পাই। পাথরের স্তূপের পাশে ছড়'নো আছে কালো রঙের স্ল্যাগ। পাথর গালিয়ে ধাতু নিষ্কাশন করার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাই হল স্ল্যাগ। ঐ সুড়ঙ্গটির সামনে বোধ হয় পাথর গালিয়ে ধাতু বের করা হত। হয়তো সুড়ঙ্গের সামনে জড়ো করা ঐ পাথরগুলোই ছিল ঐ ধাতুর উৎস।

পাথরের স্তূপটির কাছে এগিয়ে গিয়ে তা থেকে একটা নমুনা তুলে নিই। কালচে রঙের পাথরের গায়ে সোনালী রঙের ঝলক দেখতে পাই সোনা অবশ্য নয়, তামাযুক্ত খনিজ চ্যালকোপাইরাইট। সামনের এই সুড়ঙ্গটি থেকেই সম্ভবত এই তামাযুক্ত পাথর খনন ক'রে বের করা হয়েছে। অর্থাৎ এই সুড়ঙ্গটি সেই প্রাচীন তামার খনি, যার সন্ধানে এখানে বল্-সাহেব এসেছিলেন।

এই তামার খনিতেই হয়তো কাজ করতে এসেছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের শ্রমজীবীরা। সিংভূমের আদিবাসীরা তাদের স্বভাবসিদ্ধ শ্রমবিমুখতা এবং নির্লোভ প্রকৃতির জন্যে খনির মধ্যে কাজ করতে চায়নি, তাই অন্যান্য অঞ্চল থেকে শ্রমিক আনতে হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে যারা এসেছিল তারা তাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছিল তাদের প্রিয় বনচাঁপা ফুলের গাছের চারা। তাদের কোন চিহ্ন কোথাও নেই, কিন্তু তাদের লাগানো গাছের ফুলের রূপ বর্ণ ও গন্ধের মধ্যে অমর হ'য়ে আছে তাদের পুষ্পপ্রীতি।

বনচাঁপা ফুলের সৌরভ যে কতখানি সুদূর-প্রসারী হতে পারে, তা চড়াই বেয়ে চলতে চলতে উপলব্ধি করি। যতই এগিয়ে যাই, এ গন্ধ অনুসরণ করে আমাকে। পাহাড়ের চূড়াতে যখন পৌছলাম, তখনও তার গণ্ডীর মধ্যেই যেন বাঁধা থাকি।

এই গন্ধ অনেকটা যেন নেশার মত আচ্ছন্ন ক'রে রাখে আমাকে, তাই পাহাড়ের চূড়ার ঝুপড়িটি প্রথমে আমার নজরেই যেন আসে না।

আমার সম্বিত ফেরে জোহানের কথায়, এই যে স্যার, এই ঝুপড়িতে ইনিই থাকেন।

ব'লে যার দিকে তাকাল জোহান, তার দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠলাম। কালো পাথরে কোঁদা অতিকায় একটা মূর্তির মত বিশাল চেহারা—মুখে চোখে যেন একটা চাপা হিংস্রতা ঝিলিক দিচ্ছে।

—কী মতলবে এসেছেন আপনারা? লোকটা চাপা গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল।

—এসেছি এই পাহাড়ে যে পুরোনো খনিটা আছে তা পরীক্ষা করতে। আমি জবাব দিলাম।

—কিন্তু খনিতে না গিয়ে পাহাড়ের চূড়োয় এসেছেন কেন?

—এসেছি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে। মৃদু মন্দ হাসতে হাসতে বললাম আমি, প্রথমে বলুন, একা একা এই পাহাড়ের মাথায় বাস করছেন কেন?

—বোঙ্গার থান-এর পুরোহিত আমি। লোকটি জবাব দিল, সকলে গ্রাম ছেড়ে পালালেও আমাকে থাকতেই হবে এখানে। গ্রামের ঘরবাড়ি সব পুড়িয়ে ছাই ক'রে ফেলা হয়েছে ব'লে এই পাহাড়ের মাথায় ঝুপড়ি বানিয়ে আছি।

—গ্রামের ঘরবাড়ি সব পুড়িয়ে ফেলা হল কেন? আমি উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম।

—ঘরে ঘরে ডাইনীর উপদ্রব হচ্ছিল যে! এমন একটা ঘরও নেই যেখানকার মরদরা ডাইনীর খপ্পরে পড়েনি। বুঝলেন বাবু, এই গাঁয়ের মেয়েরা সব ডাইনী হ'য়ে যাচ্ছিল···

—কী করে? আমি অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করলাম।

—মেয়েদের ওপরে অশুভ আত্মা ভর করছিল যে। লোকটা জবাব দিল, এই পাহাড়ের আনাচে কানাচে মরা ডাইনীদের আত্মা ঘুরে বেড়ায়—সুযোগ পেলেই তারা যুবতী মেয়েদের শরীরে ভর করে

ব'লে সে ডাইনীদের লক্ষণ কী তা বুঝিয়ে দেয় আমাদের। তার প্রধান লক্ষণ হল পুরুষের প্রতি তার প্রকাশ্যভাবে আসক্তির প্রকাশ। পরপুরুষের শুধু নয়, নিজের বিবাহিত পুরুষের প্রতিও যদি কোন নারী

স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে নিজের গুপ্ত কামনাকে ব্যক্ত করে, তাকে ডাইনী ব'লে ধ'রে নিতে হবে। ডাইনীরা নিজেদের কামনা চরিতার্থ করতে গিয়ে পুরুষদের পৌরুষকে শুষে নিয়ে তাদের নিস্তেজ ক'রে ফেলে—তারপর ধীরে ধীরে তারা রক্তশূন্য হ'য়ে প্রাণ হারায়।

—জানলেন বাবু, পুরোহিত উত্তেজিত স্বরে ব'লে চলে, আপনাদের সমাজের ইংরেজী লেখাপড়া জানা সব মেয়েই ডাইনী! সেদিন একটি মেয়ে তার বরকে নিয়ে বেড়াতে এসেছিল এখানে, নিজেই একটা হাওয়া-গাড়ী হাঁকিয়ে এসেছিল। ঐ খাদান-গুহার কাছে বন-চাঁপার আড়ালে তার বরকে টেনে নিয়ে সে যা কাণ্ড করল তা আমি মুখেও আনতে পারব না। আমাদের সমাজের মেয়ে হলে তাকে মেরেই ফেলতাম ·

জোহান বললে, বোঙ্গার থানে পূজা-অর্চনা ক'রে ঠেকাতে পারছ না এই ডাইনীদের?

নিমেষে কালো হ'য়ে ওঠে পুরোহিতের মুখ। গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বললে, কোথায় আর পারছি! এই বোঙ্গার থান খুবই পুরোনো—বছরের পর বছর এখানে পুজো দেওয়া হচ্ছে, কত যে ডাইনীর মাথা কাটা হয়েছে এখানে তার হিসেব কেউ পারবে না দিতে। কিন্তু তবু ডাইনীদের উৎপাত বাড়ছে, বাড়ছে ওদের সংখ্যা··· আমার মনে হচ্ছে মেয়েরা সবই যেন ডাইনী হ'য়ে যেতে বসেছে ··

এমন সময় পকেট থেকে শুভ্রজ্যোতির ছবি বের ক'রে পুরোহিতের চোখের সামনে মেলে ধরল জোহান। তারপর স্থির দৃষ্টিতে পুরোহিতের চোখে চোখ রেখে সে বললে, এই ছেলেটাও বোধহয় ডাইনীর খপ্পরে পড়েছে, তাই না?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। পুরোহিত উত্তেজিত স্বরে বললে, এক সাংঘাতিক ডাইনীর পাল্লায় পড়েছে। দু' দিন এখানে খাদান গুহার মধ্যে থেকে অনেক বেলেল্লাপনা করেছিল। ঠিক করেছিলাম ওদের দুজনকেই পুড়িয়ে মারব—আশেপাশের গাঁয়ের লোকেদের জড়ো ক'রে তার

ব্যবস্থাও ক'রে ফেলেছিলাম—কিন্তু ওদের পোষা হাতির পিঠে চ'ড়ে পালিয়েছে ওরা···

শুভ্রজ্যোতি ও মানকীকে নিয়ে হাতিটা কোন দিকে পালিয়ে গিয়েছে বোঙ্গার থান-এর পুরোহিত তা বলতে পারে না। ভাটিন পাহাড় থেকে নেমে এসে স্থানীয় আদিবাসীদের মধ্যে খবরাখবর নেবার চেষ্টা করি। শুভ্রজ্যোতি ও মানকীকে ধরবার জন্য হাতিটাকে অনুসরণ করেছিল তারা, কিন্তু পশ্চিম দিকে গভীর বনের মধ্যে সে অদৃশ্য হ'য়ে যেতে আর তারা এগিয়ে যেতে পারেনি।

বনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব না হলেও বনের শুকনো ডালপালায় আগুন লাগিয়ে তারা সঙ্কেত পাঠিয়েছে বনের মানুষদের উদ্দেশ্যে। আগুনে উদ্ভাসিত এই সাঙ্কেতিক বার্তার অর্থ হল, বিপদজনক ভয়ঙ্কর জানোয়ার এখানকার নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে—যে ক'রে হোক তাকে মেরে ফেল··

আমি বললাম, হাতিটাকে মেরে ফেললে তো শুভ্রজ্যোতি ও মানকীও মারা পড়বে।

জোহান বললে, হাতিটাকে মেরে ফেলা অত সোজা নয়—বিশেষ করে এই হাতিটার মত চতুর হাতি।

—কী ক'রে জানলে হাতিটা চতুর?

—চতুর না হলে কি এই সব হিংস্র মানুষদের খপ্পর থেকে শুভ্র-জ্যোতিবাবু ও মানকীকে উদ্ধার করতে পারত না? আমি জানি, ওকে ওরা কিছুই করতে পারবে না···

—এখন আমরা কী করব?

—ঐ হাতির পেছনে পেছনে যাওয়া ছাড়া আর কী করতে পারি আমরা!

আমার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে বল্-সাহেবের ভ্রমণবৃত্তান্ত বের ক'রে তার পৃষ্ঠা ওলটাতে ওলটাতে আমি বললাম, ভাটিন পাহাড়ের পর পোকরিয়ার দিকে যাওয়ার কথা ছিল শুভ্রজ্যোতির। তারপর—

—এখন কি আর নিজের খুশি বা ইচ্ছেমত কোথাও যেতে পারবে! জোহান বাধা দিয়ে বললে, হাতিটা যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যেতে হবে ওদের। শুভ্রজ্যোতিবাবুর নাগাল পেতে হ'লে হাতির পেছনে পেছনে যেতে হবে।

—হাতিটা কোথায় কোন দিকে গিয়েছে তা বুঝব কী ক'রে আমরা? তাছাড়া গভীর বনের মধ্য দিয়ে পথ চলা—

—এ-সব কথা এখন থাক স্যার। সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে, এখন চলুন রাতের আস্তানা খুঁজে নিই।

ব'লে জীপের দিকে এগিয়ে যায় জোহান। তাকে অনুসরণ ক'রে আমি জীপে উঠে বসলাম।

জীপে স্টার্ট দিয়ে জোহান বললে, কিছু মনে করবেন না স্যার, ঐ সাঁওতালরা কী রকম হাঁ ক'রে আমাদের কথা শোনার চেষ্টা করছিল দেখছিলেন তো—তাই আলোচনা বন্ধ করলাম।

—কিন্তু আমাদের কথা কী ওরা বুঝতে পারত! আমি বললাম, ওরা তো বাংলা বোঝে না! তা ছাড়া বুঝলেও কী এসে যায় কিছু?

—ও কী বলছেন আপনি? জোহান অবাক হ'য়ে বললে, বুঝলে তো ওদের তুজনের খোঁজে পিছু নেবে আমাদের। মানকী ওদের কাছে ডাইনী, শুভ্রজ্যোতিবাবু ডাইনীর খপ্পরে পড়া মানুষ—ধরতে পারলে তুজনকে পুড়িয়ে মারবে যে!

—তার মানে তুমি বলতে চাও যে হাতিটার পিছু নিতে পারব আমরা! অর্থাৎ হাতি কোন পথে গিয়েছে—

—হাতিরা কোন পথে চলাচল করতে পারে মোটামুটি তার আন্দাজ আমি করতে পারি। জোহান বাধা দিয়ে বললে, এখন চুপ করুন স্যার—পরে বলব।

আসানবনীর কাছে জেলা বোর্ডের বিশ্রামগৃহে আশ্রয় নিলাম আমরা। বিশ্রামগৃহের চৌকিদার ডাল ভাত ফুটিয়ে দিল, তাই খেয়ে সামনের বারান্দায় চেয়ার টেনে বসলাম আমরা।

কৃষ্ণপক্ষের রাত সমস্ত বন ও পাহাড়ের ওপর যেন প্রকাণ্ড একটা

চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। কোন দিকে একটি আলোর স্ফুলিঙ্গও চোখে পড়ে না—এই অন্ধকারের সঙ্গে সুর মেলাচ্ছে দিগন্ত বিস্তীর্ণ বিপুল স্তব্ধতা। এ যেন আমাদের পৃথিবী নয়, একটা জনহীন গ্রহলোক। আকাশে জ্বল জ্বল করে অগণিত তারা—তার ক্ষীণ আলোয় শালবনের মাথা দেখা যায়। একটু দূরেই পাহাড়। তাকে আলাদা ক'রে পাহাড় বলে চেনার জো নেই, চারপাশের অন্ধকারই যেন আকাশের পানে উত্তুঙ্গ হ'য়ে উঠে পাহাড়ের আকার নিয়েছে।

আমার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে জোহান বললে, অন্ধকারে পাহাড়টাকে কী রকম কালো দেখাচ্ছে, তাই না? কিন্তু পুরোপুরি কালো নয়—কালোর মধ্যে একটা সাদা রঙের ফিতে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঐ দেখুন না···

জোহান যা দেখাতে চাইছিল তা আমিও দেখতে পাই। পাহাড়-জোড়া কালিমার বুকে একটা ক্ষীণ শুভ্রতা ফুটে উঠেছে ঠিক যেন কৃষ্ণপক্ষের কালো আকাশের বুকে ছায়াপথ।

—বলুন তো ওটা কী? জোহান প্রশ্ন করল।

—জানি না—মানে বুঝতে পারছি না। আমি জবাব দিলাম।

—ওটা হল হাতির চলাচলের পথ। বছর কয়েক আগে আসামের একটি হাতি-খেদার দলের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে করতে ঐ পথের খোঁজ পেয়েছিলাম আমরা। জানেন নিশ্চয়ই, শ' খানেক বছর আগেও প্রচুর হাতি ছিল সিংভূম, কেওঞ্জর, কটক, সম্বলপুর ও সুরগুজা জেলার বনের মধ্যে। তাদের সংখ্যা এখন সাংঘাতিক কমে গিয়েছে এবং তারা কোণঠাসা হ'য়ে আছে সিংভূম, কেওঞ্জর ও কটক জেলার বনাঞ্চলের মধ্যে। কিন্তু সংখ্যায় যতই কমে যাক, ঐ একটি পথ দিয়েই তারা যাতয়াত করে।

—কী ক'রে জানলে তুমি?

—হাতি-খেদার দলের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে এই পথটাকে খুঁজে পেয়েছিলাম আমরা। আমাদের সঙ্গে এখানকার একজন নব্বই

বছরের বুড়ো ছিল, সে প্রায় সত্তর বছর ধ'রে এ পথ দিয়ে হাতিদের যাতায়াত করতে দেখেছে। তার কাছে শুনেছি, তাদের পায়ে পায়ে যে পথ তৈরি হয়, তা ছেড়ে একচুলও তারা নড়ে না—প্রাণ গেলেও না। এই পথের ওপরে কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে তাকে তারা পিষে মারে। একবার একজন ফরেস্ট গার্ড এই পথের ওপরে ঝুপড়ি বানিয়ে বনের কাঠুরেদের ওপরে নজর রাখছিল, হঠাৎ একজোড়া বুনো হাতি এসে তা ভেঙে ধূলিসাৎ ক'রে দেয়…

—কিন্তু এই পথ দিয়ে মানকী ও শুভ্রজ্যোতির হাতি যে গিয়েছে তা তুমি বুঝতে পারছ কী ক'রে? ঐ হাতি তো আর এই পথ চেনে না…

—না চিনলেও চিনে নেবে ঠিক। যে পথ দিয়ে হাতিরা নিয়মিত যাতায়াত করে তার ধুলোয় তাদের গায়ের গন্ধ মিশে থাকে। …চলুন ঐ পথ দিয়েই যাই আমরা, হয়তো পেয়ে যাব ওদের নাগাল…

—ঐ পথ দিয়ে কি জীপ নিয়ে যাওয়া যাবে?

—না, জীপ নিয়ে নয়, আমরা যাব ঘোড়ার পিঠে চেপে। এখানকার থানায় আমাদের জীপটা জমা রেখে থানার বড়বাবুর কাছ থেকে ঘোড়া ধার নেব—শুনেছি বড়বাবুর কাছে তিন চারটি ঘোড়া আছে……

আমাদের জীপের বিনিময়ে দুটো ঘোড়া ধার দিতে আপত্তি করলেন না থানার বড়বাবু। ঘোড়ায় চাপার অভিজ্ঞতা না থাকলেও ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হতে আমার কোন অসুবিধে হয় না, কারণ আমার ঘোড়াটি ছিল খুবই ভদ্র। আমি তার পিঠে চেপে বসতেই সে যেন চিনে নিল আমাকে—আমার দু'হাত তার লাগাম ধ'রে রাখলেও সে অনুসরণ করল জোহানকে।

পাহাড়ের তলায় শালবনের মধ্যে রক্তরঙিন পলাশ যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। বড়ো বড়ো গাছের ফাঁকে ফাঁকে লতাগুল্মের জটিলতা

—নাম-না-জানা বনফুলের উগ্র সুবাস যেন এই ঘনীভূত উদ্ভিদের সমাবেশের মধ্যে জমাট বেঁধে আছে। জোহান তার ঘোড়া থেকে নেমে আসে। সঙ্গে সঙ্গে আমিও তার পাশে এসে দাঁড়াই। গাছপালা লতাগুল্ম ও ঘাসবনের ঘন সন্নিবেশের মধ্যে হাতির চলাচলের পথটা কোথায় প্রচ্ছন্ন আছে তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। কিন্তু রাতের অন্ধকারকে উদ্ভাসিত হ'য়ে যা ফুটে উঠেছিল দিনের আলোয় তাকে পাই না খুঁজে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর জোহান হাল ছেড়ে দিয়ে বললে, পথটা লতা-ঝোপের আড়ালে চাপা প'ড়ে রয়েছে দেখছি।

—কিন্তু রাতের অন্ধকারে তাকে দেখা গেল কি ক'রে! আমি অবাক হ'য়ে বললাম, অন্ধকারে তার মধ্য থেকে যেন আলো ফুটে বেরোচ্ছিল। আমার কি মনে হয় জান জোহান, আমার মনে হয়, হাতির যাতায়াতের পথে আলো বিকিরণকারী শ্যাওলা বা ফাঙ্গাস গজিয়েছে।

—তা হ'লে রাতের অন্ধকারে আসতে হবে আমাদের।

—অন্ধকারে পথ চলতে পারব তো?

—ফাঙ্গাস বা শ্যাওলার আলো আমাদের পথ দেখাবে।

তাই এলাম আমরা। এসে দেখলাম, আমার অনুমানই ঠিক। আঁধার ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে আলো—স্বয়ংপ্রভ ছত্রাক থেকে বিকীর্ণ রশ্মি। একটি সরলরেখা ধ'রে বেরিয়ে আসছে। তাকে অনুসরণ করলাম আমরা ঘোড়ার পিঠে চেপে। আমাদের ঘোড়াদুটি খুবই বুদ্ধিমান, ঐ আলোর রেখা অনুসরণ ক'রে বনের মধ্যে দিয়েও এগিয়ে চলে।

দিনের আলো ফুটে উঠতেই অদৃশ্য হল ঐ আলো। বনও এখানে শেষ হয়ে এসেছে।

সামনে ঢেউখেলানো মাঠ। মাঠের মধ্যে নানা আকারের পাথর। খাড়াভাবে পোঁতা আছে—জোহান বললে, এটা হো-দের সমাধি ক্ষেত্র। খোঁজ নিয়ে জানলাম কাছেই পোখরিয়া গ্রাম। ভ্যালেনটাইন বল

এর ভ্রমণবৃত্তান্তে এই সমাধি ক্ষেত্রের বর্ণনা আছে। তিনি লিখেছিলেন, হো-রা জীবিতদের চেয়ে মৃতদেরই বেশি সম্মান করে। যারা বেঁচে আছে তাদের কুঁড়েঘরের চেয়ে মৃতদের সমাধিফলক নির্মাণে তাদের অধিকতর নৈপুণ্য দেখা যায়। বড়ো আকারের পাথর ব'য়ে নিয়ে আসে তারা অনেক দূর থেকে। তারপর পাথরগুলোকে নির্দিষ্ট আকারে কেটে নিয়ে তাদের গায়ে খোদাই ক'রে তোলে রকমারি ভাস্কর্য। এই সমাধি ক্ষেত্রে গ্রামের একজন মুখিয়ার সমাধি ফলক বল্-সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাতে উৎকীর্ণ নকশাগুলি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। মুখিয়ার সমাধির পাশে তার দুই মেয়ে কুনটি ও সোমারি এবং ছেলে পাসিংয়ের সমাধি থাকলেও তার স্ত্রীর সমাধি ফলকটিকে খুঁজে পাননি বল্-সাহেব সমাধি ক্ষেত্রের কোথাও। অনেক খোঁজাখুঁজির পর শেষ পর্যন্ত গ্রামের মাঝখানে তা খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি। গাঁয়ের লোকেদের জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে তিনি জানতে পারেন যে মুখিয়া বেঁচে থাকতেই তার স্ত্রী মারা যায়—সমাধি ক্ষেত্রে সে নিঃসঙ্গ হ'য়ে পড়বে ব'লে তার মৃতদেহকে মুখিয়া তার কুঁড়েঘরের কাছেই সমাহিত করেছিল এবং সতেরো ফুট লম্বা ও ন' ফুট চওড়া একটি পাথরের ফলক পুঁতে রেখেছিল তার কবরের ওপরে। এই পাথরটি আকারে এত বড়ো ও ওজনে এত ভারি (প্রায় ন' টন) যে মুখিয়া তাকে কী ক'রে গাঁয়ের মাঝখানে টেনে এনেছিল তা ভেবে পান না বল্-সাহেব। হয়তো গাঁসুদ্ধ সকলের সাহায্যে এটা সম্ভব হয়েছিল।

বল্-সাহেবের বর্ণিত একশো বছর আগেকার সমাধি ক্ষেত্রের মধ্যে বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেনি—সমাধি ফলকের সংখ্যাও বিশেষ বাড়ে নি। হয়তো হো-রা এটাকে পরিত্যাগ ক'রে অন্য কোথাও মৃতদেহ সমাহিত করছে আজকাল।

একজন বুড়ি কাঠের বোঝা মাথায় চাপিয়ে এই সমাধি ক্ষেত্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, আমাদের দেখে সে থমকে দাঁড়ায়। খানিকক্ষণ নির্বাক বিস্ময়ে আমাদের দু-জনের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সে

বললে, ওদের দু-জনের মত তোমারও কি এখানে, এই ভুতুড়ে জায়গা-টিতে থাকতে চাও ?

—ওরা কারা ? জোহান উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, কাদের কথা বলছ তুমি ?

—একটা ডাইনী ও একজন বাঙালীবাবু—হাতির পিঠে চেপে এসেছিল এখানে। বুড়ি বিড় বিড় করতে করতে বললে, হুকুম এসেছিল ওদের পুড়িয়ে মারার, কিন্তু ওরা এই ভূতের থানে আশ্রয় নেওয়ায় ওদের কাছে ঘেঁষতে সাহস পায়নি গাঁয়ের লোকেরা। গাঁয়ের মেয়েরা অবশ্য লুকিয়ে এসেছে ওদের কাছে—

—কেন ?

—ওদের জন্য খাবার নিয়ে এসেছে, আর দেখতে এসেছে দু'জন দু'জনকে কেমন ভালবাসে। উঃ, কী সাংঘাতিক ওদের ভালবাসা··· আমরা হো-মেয়েরা ভাবতেও পারি না··

একশো বছর আগেও হো-মেয়েরা তাদের পুরুষদের কাছ থেকে ভালবাসা পাবার কথা ভাবতেও পারত না। ভ্যালেনটাইন বল্ একজন হো-যুবতীর সৌন্দর্যের প্রশংসা করতেই সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, আমাদের পুরুষরা তো আমার দিকে মুখ তুলেও তাকায় না—কাজেই আমার সুন্দর হয়ে লাভ কী ! নারীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হ'য়ে তাকে কাছে আনার বাসনা অধিকাংশ পুরুষকেই দমন করতে হত, কারণ একটি সুন্দরী মেয়েকে পেতে হ'লে মেয়ের বাপকে অন্ততপক্ষে দুটো মোষ, একটা গরু ও বিশটি ক'রে রুপোর টাকা দিতে হত। অধিকাংশ লোকের এই সামর্থ্য ছিল না, কাজেই সুন্দরী যুবতী মেয়ে তাদের কাছে আকাশের তারার মতই সুন্দর ছিল। সুন্দরী মেয়ের আশা তাই ছেড়ে দিত তারা, সাদামাটা সাধারণ মেয়ে নিয়েই খুশি থাকত এবং অধিকাংশ সুন্দরী কুমারীই বাধ্য হত আজীবন অবিবাহিত থাকতে।

—ওরা দু'জনে কোথায় গিয়েছে বলতে পার? বুড়ির হাতে দুটো টাকা গুঁজে দিয়ে প্রশ্ন করলাম।

—তা বলতে পারব না। বুড়ি বললে, তবে ওরা ওদের হাতির পিঠে চেপে গিয়েছে, রাতের আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে চুপি চুপি গিয়েছে···

বুড়ি চ'লে গেলে পর আমি বললাম, এই ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়ে হাতিটা কোন দিকে গিয়েছে তা বুঝবে কী ক'রে?

জোহান বললে, মাঠ আর কতটুকু—চারপাশেই বন। দক্ষিণ পশ্চিম দিকে বাঁশপানির বনের মধ্য দিয়ে হাতিদের চলাচলের পথ আছে, হাতিটা হয়তো ঐ দিকেই গিয়েছে··

৯

গভীর বন যেন আদিম অকর্ষিত অরণ্যের একটি দৃষ্টান্ত। শাল, পিয়াশাল, ধও প্রভৃতি বড়ো বড়ো গাছের মাঝখানকার সব ফাঁক ভরাট ক'রে দিয়েছে ঘন লতাগুল্ম—ঘন সবুজের মাঝখানে নিবিড়তর সবুজের এমন ঠাসবুনানি আর কোথাও দেখিনি। এই জমাটবাঁধা সবুজের মধ্য দিয়ে হাতিদের চলাচলের পথটি যেন চূড়ান্ত দুর্গমতার সঙ্গে সংগ্রামের চিহ্ন। এর মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে আমাদের ঘোড়াদুটিরও কষ্ট হয় রীতিমত। মাঝে মাঝে মনে হয় যেন তারা মাঝপথেই থমকে দাঁড়াবে—পথের ধকল সইতে না পেরে হয়তো মুখ থুবড়ে পড়বে লতাঝোপ বা ঘাসবনের মধ্যে। চলতে চলতে বা দুর্গমতাকে সইতে না পেরে এই থেমে যাওয়া মানেই হল বনের মধ্যে বন্দী হ'য়ে থেকে বন্য পশুর খপ্পরে পড়া।

কিন্তু আমাদের ঘোড়াদুটির কষ্ট সইবার ক্ষমতা ও দেহের শক্তি দুই-ই অসাধারণ। ঘন বনে ছাওয়া এই অতি দুরারোহ পাহাড়কে তারা যেন তাদের পায়ে পায়েই জয় ক'রে নেবে।

এই দুরন্ত চড়াই বেয়ে যতই উঠতে থাকি, ততই দু-ধারের বন ঘনীভূত হ'য়ে আমাদের দুদিক থেকে চেপে ধরতে থাকে। বড়ো বড়ো গাছের ডালপালা আমাদের মাথার ওপরে চাঁদোয়ার মত আবরণ সৃষ্টি করে। বন যত ঘন হ'য়ে ওঠে তার রং ততই যেন কালো হ'য়ে উঠতে থাকে। সামনে উত্তুঙ্গ পাহাড়ের চূড়া, তার ওপরকার বড়ো বড়ো গাছগুলো অদ্ভুত রকম বেঁটে দেখাচ্ছে।

যতই উত্তুঙ্গ বা দুর্গম হোক, ঘোড়াদুটো অনায়াসে উঠে পড়ে পাহাড়ের শীর্ষে, তারপর নামতে শুরু করে উলটো দিকের উৎরাই বেয়ে। নামতে নামতে একটা সংকীর্ণ উপত্যকার মধ্যে ঢুকে পড়ি।

এখানে পাহাড়ের স্তূপের আড়ালে খানিকটা পরিষ্কার জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে দশ বারো জন যাযাবর শ্রেণীর মানুষ। মাটির ওপরে অসংখ্য বাঁদরের চামড়া বিছিয়ে দিয়েছে তারা—চামড়াগুলো বোধ হয় শুকিয়ে নিচ্ছে, যাতে তাদের মধ্যে পচন না ধরে। কয়েকটি সন্থ-মারা বাঁদরের মৃতদেহও পড়ে আছে।

—এরা হল মাকরিয়া। জোহান বললে, বাঁদর মারা এদের পেশা। এরা বাঁদরের মাংস খায়—বিক্রী করে বাঁদরের চামড়া।

বাঁদর ধরা ও মারা যাদের পেশা এমন আর একটি সম্প্রদায়ের দেখা পেয়েছিলেন ভ্যালেনটাইন বল্। তাদের নাম "বেহুর"। বেহুরদের কথা অবশ্য শোনেনি জোহান, কোথায় থাকে তারা, তা সে পারে না বলতে।

বাঁশপানির বনাঞ্চল পেরিয়ে যেতেই বনের চেহারা কিছুটা পালটে যায়; বন আর তেমন বন্য বা wild নয়। বনবিভাগের কিছু ক্রিয়াকলাপ চোখে পড়ে এখানে ওখানে—বন্য বনভূমির পাশাপাশি বনবিভাগ-কৃত সেগুন ও ইউক্যালিপটাস-এর বাগান চোখে পড়ে। বৃক্ষরোপণ ছাড়া বৃক্ষ-নিধনের তৎপরতাও দেখা যায়। পানপোসের কাছে একটি বড় করাত-কল আছে।

বনবিভাগের তত্ত্বাবধানে নিয়ন্ত্রিতভাবে গাছ কাটা চললেও তা মনকে পীড়িত করে। দরজা-জানালা, কড়ি-বরগা, আসবাবপত্র প্রভৃতির জন্য গাছ না কেটে উপায় নেই, কিন্তু তবু মনে হয় প্রকৃতির কাছে যেন ঘোরতর অপরাধ করছি।

বনবিভাগের নিয়ন্ত্রণ আপাতদৃষ্টিতে যত কঠোর হোক, জায়গায় জায়গায় নির্দিষ্ট মাত্রাকে ছাপিয়ে যায় বৃক্ষসংহার পর্ব। পানপোস থেকে কিছুদূরে এক জায়গায় এমনি বৃক্ষশূন্য বন দেখলাম। জায়গাটি মানচিত্রে বন ব'লে চিহ্নিত হ'লেও নির্বিচার গাছকাটার দরুন তা একটি মরুক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

এখানে যখন পৌছলাম তখন বেলা দুপুর। পিপাসার্ত ঘোড়াটির জন্য জল খুঁজতে গিয়ে দেখি যে, গাছপালার সঙ্গে সঙ্গে জলও ওখান

থেকে উবে গিয়েছে—মাটির তলায় জলের স্তরও হয়েছে নিশ্চিহ্ন।

চারদিকে তাকিয়ে রৌদ্রদগ্ধ বৃক্ষশূন্য রিক্ততার ভয়াবহ রূপ প্রত্যক্ষ করি। নির্মম ধোঁয়াটে আকাশে সূর্য যেন অগ্নিকুণ্ড—তারই ধূ-ধূ আগুনের ঢেউ ঈথারের স্তর ভেদ ক'রে এখানকার গাছপালার শিরা উপশিরা থেকে সব রস শুষে নিচ্ছে—শোষণ করছে মাটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন সব রস। দিগ্‌দিগন্ত ঝলসে পুড়ে অনাবৃত করছে এক ভয়াবহ নিদারুণ শুষ্কতা। মাটি থেকে সব জলীয় বাষ্প ধোঁয়া হ'য়ে বেরিয়ে যাচ্ছে—রোদে ফুটিফাটা প্রান্তরের ওপরে কম্পমান তাপতরঙ্গ, তাপজনিত একটা অস্পষ্ট কুয়াশা রৌদ্রদগ্ধ রিক্ততার বক্ষ ভেদ ক'রে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখি তাম্রাভ কটা আকাশ—একেবারে শূন্য, সেখানে একটা চিলও উড়ছে না।

এই নিদারুণ শুষ্কতার মধ্যে এক ফোঁটা জলও পাওয়া যাবে ব'লে মনে হল না। কোথাও কোন কুয়ো বা নলকূপ নেই। দু-একটি পরিত্যক্ত গ্রামের ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ল, জলের অভাবের জন্য এই সব গ্রাম পরিত্যক্ত হয়েছে ব'লে আন্দাজ করি।

জলের আশা যখন প্রায় ছেড়ে দিতে যাচ্ছি, তখন হঠাৎ একটি ঢিবির তলায় একটি জলের কুণ্ড আবিষ্কার করলাম। কুণ্ডের মধ্যে জল আছে, টল টল করছে স্বচ্ছ নির্মল জল। হয়তো তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ফোয়ারা দিয়ে ভূগর্ভের জলের স্তর থেকে বেরিয়ে আসছে এবং চারপাশের নির্জলা শুষ্কতার মাঝখানে সৃষ্টি করেছে এই জলের আধার।

এত জল, কিন্তু জলের ধারেকাছেও কেউ-ই নেই। স্থানীয় লোকেরা হয়তো খবরই রাখে না এই জলের আধারের। পশুপাখিরাও কি পায়নি এই জলের হদিস! ব্যাপারটা বিস্ময়কর ব'লে মনে হয়। তার বুদ্ধিগ্রাহ্য কোন ব্যাখ্যা খুঁজে না পেলেও তা নিয়ে মাথা ঘামাই নে আমি ও জোহান, কারণ তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে আমাদের দু-জনেরই।

আমাদের মত আমাদের ঘোড়াদুটিও খুবই তৃষ্ণার্ত। হয়তো আমাদের চেয়ে বেশি তাদের তৃষ্ণা। কিন্তু তারা জলের ধারে যেতে চাইল না। লাগাম ধ'রে অনেক টানাটানি করলাম জোহান ও আমি,

কিন্তু জলের দিকে একপাও নড়ল না—ব্যস্ত হ'য়ে উঠল জলের বিপরীত দিকে যাবার জন্য। আমরা লাগাম ছেড়ে দিলে হয়তো ছুটে পালাত এই জল থেকে অনেক দূরে।

—ঘোড়াদুটির কি জলাতঙ্ক হয়েছে! জোহান অবাক হয়ে বললে, তেষ্টা পেলেও জল দেখে এমন ভয় পাচ্ছে কেন?

—আমার মনে হচ্ছে জলটা বিষাক্ত। আমি বললাম। ঐজন্যেই হয়তো এই জলের ধারেকাছেও ঘেঁষতে চাইছে না ঘোড়াদুটি।

—জল যে বিষাক্ত তা ওরা বুঝল কী করে? জোহানের চোখদুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

—জল দেখেই হয়তো বুঝতে পেরেছে—কিংবা হয়তো বাতাসে কোন গন্ধ পেয়েছে। এ ব্যাপারে পশুপাখিদের সহজাত অন্তর্দৃষ্টি আছে। চল, জলটাকে পরীক্ষা ক'রে দেখি··

ব'লে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ি আমি। আমার দেখাদেখি জোহানও নামে। তারপর দু-জনে মিলে জলের ধারে গিয়ে দাঁড়াই।

জলের ধারে গিয়ে আমরা দাঁড়াতেই আমাদের গা গুলিয়ে ওঠে—একটা উগ্র কটু গন্ধ জলের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছে। হয়তো জলের মধ্যে কিছু ধাতু ও গন্ধকের সমাহরণ ঘটেছে। এ জল পানের যোগ্য নয়, মুখে দেওয়া-মাত্র হয়তো বিষক্রিয়া ঘটবে।

জল আছে, কিন্তু আমাদের তৃষ্ণা মেটাবার মত জল কোথাও নেই। তবে কি বুকজোড়া তৃষ্ণা নিয়ে আমাদের বাহন ঘোড়াদুটিসহ মারা পড়ব আমরা!

আতঙ্কে শিউরে ওঠে আমার বুকের ভেতরটা। জোহানের মুখের দিকে কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমি বললাম, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ অঞ্চল থেকে পালিয়ে যাই চল—জল কোথায় আছে সে খবর নিয়ে সেদিকেই যাই···

—না, না। স্থির গম্ভীর গলায় জোহান বললে, যে রাস্তা ধ'রে যাচ্ছি, সেই রাস্তা দিয়ে যেতে হবে। হাতিদের আসা-যাওয়ার পথের ধারে কোথাও-না-কোথাও জল পাওয়া যাবেই···

জল পাওয়া গেল ঘণ্টা আড়াই বাদে সিমডেগার মালভূমির নীচে। পানপোস থেকে কত দূরে এসেছি বুঝতে পারছি না, বোঝার ক্ষমতাও ছিল না, দুঃসহ পিপাসা ও শ্রান্তির দরুন মনে হচ্ছিল যেন অন্তবিহীন পথ পেরিয়ে এসেছি। পাহাড়ের নীচে পাথর ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে জলের ধারা—নিবিড় বনের মধ্য দিয়ে ঝির ঝির ক'রে ব'য়ে যাচ্ছে পাথরের ওপর দিয়ে। জল দেখামাত্র ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ি—ক্ষ্যাপার মত ছুটে যাই ঐ ঝরনার ধারে, তৃষ্ণার্ত বনের পশুর মতই ঝুঁকে পড়ি জলের ওপরে। নির্জলা শুকনো মরুভূমির পিপাসা আমার কণ্ঠে, গালের দু' কষ বেয়ে ফেনা বেরিয়ে আসছে—জলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে জল শুষে নিতে থাকি বনের পশুদের ভঙ্গীতে। এক নিঃশ্বাসে বেশ কিছুটা জল টেনে নেওয়ার পর কিছুটা সুস্থ বোধ করি এবং মুখ তুলে তাকাই আমার চারপাশে। আমার পাশেই আমার ঘোড়াটি জল খাচ্ছে, অদূরে জোহান ও তার ঘোড়াটিও জলে মুখ ডুবিয়েছে। একজোড়া নীলগাই, চিতল হরিণ ও বুনো দাঁতালো শুয়োরকেও দেখলাম নিঃশব্দে জল খেতে। হঠাৎ একটি চিতাবাঘও যোগ দিল আমাদের সঙ্গে। তৃষ্ণা নিবারণে হিংস্র ও অহিংস্র প্রাণীদের এমনি অহিংস সহাবস্থান মনকে মুগ্ধ করে।

জলের তেষ্টা এতক্ষণ আমাদের ক্ষুধার জ্বালাকে চাপা দিয়ে রেখেছিল। তেষ্টা মিটতেই সে তার ন্যায়সঙ্গত দাবী নিয়ে মোচড় দিয়ে ওঠে পেটের মধ্যে। পেটের মধ্যে নিঃশব্দে সে আর্তনাদ ক'রে চলে 'আমার দাবী মানতে হবে'—কিন্তু তার দাবী মেটাবার মত রসদ এখানে কোথায়? একটানা নিবিড় অরণ্যের মধ্যে কোন গ্রাম চোখে পড়ছে না, কোন চাষবাসের প্রয়াসও দেখতে পাচ্ছি না। বনের মধ্যে মানুষের খাদ্য ফলমূল আছে কিনা জানি না।

জোহান বললে, হাতির যাতায়াতের পথে বনের মানুষরা কিছু চাষবাস করে। হাতির পায়ে পায়ে পাথুরে মাটি বেশ নরম হ'য়ে ওঠে, তার সঙ্গে হাতির নাদ মিশে মাটিকে বেশ উর্বর ক'রে তোলে। ভালো ক'রে নজর রেখে চলুন, দেখতে পাবেন···

ভালো ক'রে নজর রাখার ক্ষমতা আমার ছিল না, কিন্তু দেখা পেয়ে যাই কয়েকজন হো-মেয়ের—লতাপাতা দিয়ে তৈরী ঝুপড়ির সামনে বড় মাটির হাঁড়িতে কী যেন রান্না করছে।

ওদের দেখামাত্র যে আনন্দ পেলাম, আমেরিকা আবিষ্কারে কলম্বাসও হয়তো ততোটা আনন্দ অনুভব করেননি। ওদের মেটে হাঁড়িতে যা সেদ্ধ হচ্ছে তার ভাগ আমরা কি পেতে পারি না? পকেটে আমাদের টাকার অভাব নেই, বিনিময়ে ওদের এই খাদ্যের কিছুটা আমাদের দিতে নিশ্চয়ই আপত্তি করবে না।

জোহানের মাধ্যমে আলাপ করি ওদের সঙ্গে। পয়সা দিয়ে আমি ওদের আতিথেয়তা কিনতে চাই জেনে ক্ষেপে ওঠে ওরা। ওদের মধ্যে বয়সে যে অপেক্ষাকৃত বড়ো সে আমার মুখের ওপরে অগ্নিদৃষ্টি হেনে বললে, খেতে হয় এমনি খাও—পয়সা দিয়ে আমাদের খাবার কেনার কথা মুখেও আনবে না।

ওদের সঙ্গে বসে পেট ভ'রে খেলাম আমরা কোন্দো ও মেটে আলু সেদ্ধ। কোন্দো হল এক ধরনের ঘাসের দানা, তা সেদ্ধ করলে অনেকটা ভাতের মত দেখায়। জোহানকে প্রশ্ন ক'রে জানি যে, এখানে পাহাড়ের গায়ে ধান হয় না, ধানের বদলে কোন্দোর চাষ করে এখানকার লোকেরা। কোন্দোর দানা সেদ্ধকে এরা ভাত ব'লেই জানে এবং আমাকে আরও খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে গিয়ে বলে, আরও দুটি ভাত নাও···

—মেটে আলু সেদ্ধ দিয়ে কোন্দোর ভাত, এ ছাড়া আর কিছু খাও না তোমরা?

—না, আমরা এই-ই খাই।

—বিনা নুনে এগুলো খেতে তোমাদের কষ্ট হয় না?

—একটুও না। আমরা তো আর বিলাতের মানুষ বা জানোয়ার নই যে নুন বিনা খাবার রুচবে না আমাদের মুখে।

—বিলেতের মানুষ তো আমরাও নই! ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে বললাম আমি।

—বিলাতের মানুষ না হও তো তোমরা জানোয়ার। পেটের কৃমি সারাবার জন্য জানোয়ারেরাই পাহাড়ের নুন চাটে···

—আঃ, কী সব যা-তা বলছ তোমরা! ধমক দিয়ে উঠল জোহান, জানো উনি কে?

—চুপ করো জোহান। আমি মৃদু ধমক দিলাম জোহানের উদ্দেশে: আমি কে, তা ওদের ব'লে লাভ কী!

তারপর আমি মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললাম, এই জঙ্গলের মধ্যে, হাতিদের যাতায়াতের পথের ধারে থাকতে তোমাদের ভয় করে না?

—ভয় কিসের! মেয়েদের মধ্যে একজন বললে, ওরা তো আমাদের কোন ক্ষতি করে না।

—তোমরা বেছে বেছে হাতিদের চলাচলের পথের ওপর ঝুপড়ি বানিয়েছ কেন? চলতে চলতে যদি মাড়িয়ে দেয়···

—তা দেয়। কতবার আমাদের ঝুপড়ি ওরা ভেঙে দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তবু আমরা ওদের কাছাকাছি থাকি।

—কেন?

—ওদের পায়ে পায়ে মাটি নরম হয়—তাতে কোন্দো ও মেটে আলুর ভালো ফলন হয়···

—তোমাদের সঙ্গে তো কোন পুরুষমানুষ নেই, পুরুষদের বাদ দিয়ে একা একা থাকতে তোমাদের ভয় করে না?

—একটুও না, ওরা কাছে থাকলেই আমাদের ভয়।

—কেন?

—ওদের ছেড়ে আমরা পালিয়ে এসেছি কিনা—

—ওরা তোমাদের পিছু নেয়নি?

—না, হাতিদের বড়ো ভয় পায় ওরা।

—আর একটা কথা, এক জোড়া মেয়ে ও পুরুষকে পিঠে নিয়ে একটা হাতিকে এ পথ দিয়ে যেতে দেখেছ তোমরা?

এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাওয়া-

চাওয়ি করে। ওদের মুখের ভাবে বুঝতে পারি, আমার এ প্রশ্নের জবাব ওরা দিতে চায় না।

—কী হল, চুপ ক'রে রইলে কেন? আমি বললাম, বলো, ওদের তোমরা দেখেছ কি না?

মেয়েদের মধ্যে যে মেয়েটি এতক্ষণ আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল তার নাম আসাই কুই, সে-ই বললে, তোমরা ওদের কোন ক্ষতি করবে না তো? ওদের ধ'রে ফেলে পুড়িয়ে মারবার মতলবে ওদের পিছু নাওনি তো?

—না, না, ওদের যারা পুড়িয়ে মারবে ঠিক করেছে, তাদের হাত থেকে ওদের হু'জনকে বাঁচাতে চাই, তাই যাচ্ছি এই বনের মধ্য দিয়ে···

—ঠিকই যাচ্ছ—এই পথ দিয়েই হাতিটা গিয়েছে ওদের হু'জনকে পিঠে ক'রে। হাতি মানে মাদী হাতি, নাম তার ঝিমলী। ওদের হু'জনের জান বাঁচাবার জন্য ঝিমলী ওদের হু'জনকে নিয়ে হুনিয়ার একেবারে শেষ অব্দি যাবে ব'লে মনে হয়··

—হুনিয়ার শেষ অব্দি নয়, জোহান বললে, এ পথের শেষ পর্যন্ত যাবে নিশ্চয়ই। এ পথের শেষ আমি দেখিনি—বোধ হয় সুরগুজা জেলার কোন একটি জায়গায় গিয়ে শেষ হয়েছে···

ঐ পথ অনুসরণ ক'রে আমরা হু'জনে গভীর থেকে গভীরতর বনের মধ্যে ঢুকে পড়ি। বন যত গভীর হয়, তার গাছপালার নিবিড় সবুজ রং বদলে কালো হ'য়ে যেতে থাকে ক্রমশঃ। যে-সব গাছপালা এই হুর্গম বনক্ষেত্রটিকে রচনা করেছে তারা হল খুব বড়ো আকারের শাল, পিয়াশাল, আসান, খও, জাম, লুকুজাম, কেঁদ, আমলকী, হরিতকী প্রভৃতি গাছ। জায়গায় জায়গায় বড়ো গাছগুলো অদৃশ্য হ'য়ে গিয়েছে, দেখা দিয়েছে মুচুকুন্দ, আতগুী, কুরচি, চিহোড় প্রভৃতি লতা। মুচুকুন্দ ও কুরচি ফুল ফুটেছে, নিবিড় সবুজ বনের অতলস্পর্শী গাম্ভীর্যের মধ্যে যেন তারা খুশির জোয়ার বইয়ে দিয়েছে।

সন্ধ্যা ঘনায়। সমস্ত বন যেন অন্ধকারের খাপের মধ্যে ঢুকে পড়েছে—সামনের চড়াই যেন অন্ধকারের তরঙ্গিত রূপ। হঠাৎ

পাহাড়ের গায়ে আগুন জ্বলে ওঠে—যেন রক্তের ধারা বেরিয়ে আসে আঁধারের বুক ফুঁড়ে...

বনের শুকনো ডালপালা ও পাতার রাশির মধ্যে আপনা থেকেই আগুন জ্বলছে, এতে মানুষের কোন হাত নেই। একেই বলে দাবানল। এই আগুন দেখে ভয় পেয়ে যাই আমরা, আগুন না নেভা পর্যন্ত আর এক পাও এগিয়ে যাওয়া যাবে ব'লে মনে হয় না। অগত্যা জোহান ও আমি দু'জনেই নেমে পড়ি ঘোড়ার পিঠ থেকে।

আমরা নেমে পড়লেও ঘোড়াদুটি অস্থির হ'য়ে ওঠে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। মাটিতে পা ঘষতে থাকে, তীব্র হ্রেষাধ্বনি বেরিয়ে আসে তাদের গলা থেকে। বুঝতে পারি যে, এখানে এমন কিছু আছে যার জন্য তারা ভয় পাচ্ছে এখানে থাকতে।

ইতিমধ্যে কৃষ্ণপক্ষের একফালি চাঁদ বনের পশ্চিম প্রান্ত থেকে আকাশে উঠেছে, তার অস্ফুট আলোয় চিহোড় লতাঝোপের সামনে প'ড়ে থাকা গাছের গুঁড়িটাকে ন'ড়ে উঠতে দেখলাম। নিশ্চল গাছের গুঁড়ির ন'ড়ে ওঠা অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য। আমার কাঁধের ঝোলা থেকে পাঁচ সেলের টর্চ বের ক'রে তার জোরালো আলো তার ওপরে ফেলতেই তা আরও ন'ড়ে উঠে শুকনো পাতার স্তূপে মৃদু মন্দ মর্মরধ্বনি জাগায়। পরমুহূর্তে হিস হিস শব্দে গাছের গুঁড়িটা একটা প্রকাণ্ড সাপের আকার নিয়ে ফণা তুলে দাঁড়াল।

—শঙ্খচূড় সাপ! জোহান ফিসফিসিয়ে বললে, তেড়ে এসে ছোবল মারবে—চলুন, পালিয়ে যাই।

ঘোড়াদুটির ভয়ের কারণ এবারে পরিষ্কার হল। আমরা ছুটে গিয়ে চ'ড়ে বসি তাদের পিঠে। তারা ছুটে চলল সামনের দিকে। অদূরেই আগুন, কিন্তু তাদের কাছে আগুনের চেয়েও ভয়ঙ্কর এই শঙ্খচূড় সাপ—শঙ্খচূড়ের ছোবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা আগুনে ঝাঁপ দিতে চলেছে...

১০

ভ্যালেনটাইন বল্ ও অন্যান্য ইংরেজ ভূতাত্ত্বিক পর্যটকরা এই শঙ্খচূড় সাপকে ভারতীয় অরণ্যের মধ্যে হিংস্রতম জীব ব'লে বর্ণনা করেছেন। বল্-সাহেব লিখেছেন, বরঞ্চ হিংস্র মানুষ-খেকো বাঘের হাত থেকে আত্মরক্ষা সম্ভব, কিন্তু শঙ্খচূড় সাপের আক্রমণ থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। অনেক ইংরেজ ভূতাত্ত্বিক সব রকম বন্য প্রাণীর সঙ্গে মুখোমুখি মোকাবিলা করলেও শঙ্খচূড় সাপের সঙ্গে পেরে উঠেননি। তাকে মারতে গিয়ে তার ছোবল খেয়ে তিনি নিজেই মারা পড়েন।

শঙ্খচূড় সাপের ইংরেজী নাম King Cobra। সাপেদের রাজার শিরোপা-ই তার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তাকে পশুদের রাজাও বলা চলে—কারণ বনের পশুরা সকলেই ভয় পায় তাকে। বনে বনে যারা চ'রে বেড়ায় তারা দেখেছে, যেখানে শঙ্খচূড় সাপ আছে, সেখানে অন্য কোন বন্য প্রাণী নেই।

যশপুর নগরে পৌছে তার আশেপাশে অনেক জায়গাতেই শঙ্খচূড় সাপের প্রাধান্যের গল্প শুনতে পাই। ওখানকার পূর্ণেন্দু দাশগুপ্ত আমাকে বলেছিলেন শঙ্খচূড়ের এলাকা এটা—এখানে আর সব জানোয়ার শুধু পালিয়েই বেড়ায় তার ভয়ে।

শঙ্খচূড় সাপ সম্বন্ধে আর একটা কথা বলেছিলেন পূর্ণেন্দুবাবু। কথাটা অবশ্য অবিশ্বাস্য। তিনি বলেছিলেন, আপনারা বিশ্বাস করুন বা না করুন, শঙ্খচূড়ের মাথায় মণি দেখেছি আমি···

—কোথায় দেখেছেন? আমি প্রশ্ন করলাম।

—যশপুর নগর থেকে মাইল দুয়েক দূরে বনের মধ্যে দেখেছি। সেখানে প্রকাণ্ড কালো রঙের একটি সাপ মাথায় লাল রঙের মণি নিয়ে

ঘোরাঘুরি করছে। মণি থেকে আলো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, সমস্ত বন আলোয় আলোকময় হ'য়ে উঠেছে···

বলা বাহুল্য, সাপের মাথায় মণির কথা কেউ বিশ্বাস করেনি, আমিও না। ভেবেছিলাম, পূর্ণেন্দুবাবুর সঙ্গে গিয়ে দেখে আসব, কিন্তু তা আর হয়ে উঠেনি।

নিমডেগা হ'য়ে যশপুর নগরের দিকে আসতে ভূ-প্রকৃতি ও গাছ-পালার মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখতে পাই। শাল, শিমুল, আসান ও কেঁদ গাছের দুর্ভেদ্য সমাবেশের পাশাপাশি ফার্ন-এরও আবির্ভাব ঘটে। ক্রমশঃ তিন হাজার ফুটেরও ওপরে উঠে আসি। বনের ফাঁকে ফাঁকে আঙ্গুর ও আপেলের বাগান দেখা যায়—কমলালেবুর গাছও চোখে পড়ে মাঝে মাঝে। রাশি রাশি ফুলের সমারোহ দেখি দেবকাঞ্চন ও বন-শিউলির ডালে ডালে। বনের এই রঙিন অংশ পেরিয়ে পৌছে যাই যশপুর নগর।

যশপুর নগর মধ্যপ্রদেশের একটি ছোট পার্বত্য শহর। এককালে সেণ্ট্রাল এজেন্সির অন্তর্ভুক্ত করদ-রাজ্যের রাজধানী ছিল। পাহাড়ের কোলে শহরটা যেন রূপকথার মায়াপুরী, ঢেউখেলানো সবুজের গায়ে ছবির মত ঘরবাড়ি ও ফুল বাগান। নিবিড় অরণ্য যেন যাদুমন্ত্রবলে এই চোখ জুড়ানো শহরের রূপ নিয়েছে।

শহরের সীমা পেরিয়ে শহরের মধ্যে ঢোকা অবশ্য আমাদের হয়ে ওঠেনি, কারণ শহরের বাইরেই আমাদের পথ আগলে দাঁড়ালেন পূর্ণেন্দু ও তাঁর স্ত্রী হিমানী।

আমরা ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতেই পূর্ণেন্দুবাবু মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে বললেন, যে পথ ধরে হাঁটছেন, সে পথ তো আর শহরের মধ্যে ঢোকেনি। তা ছাড়া শহরে থাকার কোন জায়গাও পাবেন না··· কাজেই—

—থাকতে-ই তো চাই আমরা। বাধা দিয়ে বললাম আমি, চাই একটু বিশ্রাম—আর খাবার···

—সব পাবেন আমার এখানে। চান তো আমার স্ত্রী হিমানী

এখনই আপনাদের হরিণের মাংস দিয়ে ভাত খাইয়ে দিতে পারে। আসুন আমার গরিবখানায়।

পূর্ণেন্দুর অনুসরণ ক'রে তাঁর "গরিবখানা" অর্থাৎ বাগানবাড়িতে পৌছে গেলাম। বাগান মানে এই বনেরই একটা অংশ। বনের সব রকম গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে অবশ্য দেশী ফুল ও ফলের সমারোহ চোখে পড়ছে। বাড়ির সামনে ঘোরানো বারান্দায় বেতের চেয়ারে আমরা বসলাম পাশাপাশি। পূর্ণেন্দুর স্ত্রী হিমানীর পরিবেশন করা পেস্তার সরবত সহযোগে আমাদের গল্প জমে ওঠে। আলাপের গোড়াতেই তিনি আমাকে জানালেন, যে পথ দিয়ে আমরা যাচ্ছি তিনিও সেই পথেরই পন্থী। অর্থাৎ হাতির চলাচলের পথের ওপরে রকমারি জড়িবুটি, বনঔষধি গজায়, সেগুলো সংগ্রহ করে বিদেশে রপ্তানী করেন তিনি।

—হাতির চলাচলের পথে এগুলো গজায় কেন? আমি প্রশ্ন করি।

—হাতির পায়ে পায়ে তাদের বীজ ছড়িয়ে পড়ে কিনা। পূর্ণেন্দু জবাব দিলেন, তাছাড়া ওদের যাতায়াতের পথের বিশেষ একটা উর্বরতা আছে, যা বনের মধ্যে অন্যত্র নেই। এবারে আপনারা বলুন, এই পথের ওপরে আপনাদের পক্ষপাতের কারণ কী?

—একটা মাদী হাতির পিছু নিয়েছি আমরা। আমি জবাব দিলাম, তার পিঠে চেপে পালাচ্ছে শুভ্রজ্যোতি নামে একটি বাঙালী ছেলে ও মানকী নামে একটি আদিবাসী মেয়ে। আদিবাসীরা তাদের পিছু নিয়েছে। ধরতে পারলে হয় তাদের দেবতার থানে বলি দেবে, নয়তো পুড়িয়ে মারবে।

—ওরা তো এখান দিয়েই গেল। কিন্তু আদিবাসীদের ভয়ে ওদের দু-দিনের বেশি আশ্রয় দিতে পারিনি আমাদের এখানে।

—হাতিটার পিঠে চেপে এই পথ দিয়েই গিয়েছে তো ওরা?

—হ্যাঁ, ওদের সঙ্গ নিয়েছে আর একটা হাতি—সে-ই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আর একটা হাতি এল কোথা থেকে ?

—প্রতাপপুরের বনের বুনো দাঁতালো হাতি। ঝিমলী যখন শুভ্রজ্যোতি ও মানকীকে নিয়ে এখানে এল, তখন আমার এখানে এসেছিল সে প্রতাপপুরের বন থেকে জুড়িবুটি নিয়ে।

—ঐ হাতিটাকে আপনি পোষ মানিয়েছেন বুঝি ?

—না, ও নিজেই আমার পোষ মেনেছে। শিকারীর গুলি খেয়ে জখম হয়েছিল মাস ছয়েক আগে, তখন আমিই চিকিৎসা ক'রে সারিয়ে তুলেছিলাম ওকে।

—আপনি কি ডাক্তার ?

—না, ডাক্তার আমি নই—কিন্তু ডাক্তারি জানি, বিশেষ ক'রে পশুদের রোগের ডাক্তারি। প্রতাপপুরের জঙ্গলের শেষ হাতি এই বনরাজের কৃতজ্ঞতা-বোধ খুবই প্রবল—আমি যে তার প্রাণ বাঁচিয়েছি তা সে কখনোই ভুলবে না। তাই নিয়মিত প্রতাপপুরের জঙ্গল থেকে জড়িবুটি, শেকড়-বাকড় কুড়িয়ে নিয়ে আসছে। আমার যা-যা দরকার সব ওকে চিনিয়ে দিয়েছি—গভীর বনের মধ্য থেকে নির্ভুল-ভাবে সেগুলো তুলে নিয়ে আসে মাসে একবার ক'রে। এবারেও যথারীতি জড়িবুটির বোঝা পিঠে চাপিয়ে এসেছিল সে। আসামাত্রই ঝিমলীর সঙ্গে তার দেখা, যাকে বলে চারচক্ষুর মিলন···

—তারপর ? উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম।

—তারপর যা ঘটবার তা ঘটল। বনরাজের এখন "মস্ত" অবস্থা ···ঝিমলীর শরীরও গরম হয়ে আছে·· ঝিমলী ওদের দুজনকে পিঠে নিয়ে প্রতাপপুরের জঙ্গলের দিকে রওনা হতেই বনরাজ তার পিছু নিয়েছে। বনরাজ নিশ্চয়ই তার প্রতাপপুরের আস্তানায় ঝিমলীকে নিয়ে নতুন সংসার পাতবে।

—তার মানে শুভ্রজ্যোতি ও মানকী ঝিমলীর কাছ থেকে আর কোন সাহায্য পাবে না।

—নিশ্চয়ই পাবে, আরও বেশি ক'রেই পাবে। কারণ ঝিমলীর

সঙ্গে বনরাজেরও সাহায্য পাবে। বনরাজকে আমি বুঝিয়ে দিয়েছি, ঝিমলীর সঙ্গে শুভ্রজ্যোতি ও মানকীর নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে হবে।

আমি অবাক হয়ে পূর্ণেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, বনরাজ কি আপনার কথা বুঝতে পারে?

—কথা বুঝতে না পারুক, আমি যা বলতে চাই তা বুঝতে পারে। পূর্ণেন্দু জবাব দিলেন, শুভ্রজ্যোতি ও মানকীর গায়ে হাত দিয়ে ইশারায় ওকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছি আমার বক্তব্য।

—শুভ্রজ্যোতি ও মানকীর নাগাল পেলে আমরাই ওদের দায়িত্ব নিতে পারব, ঝিমলী ও বনরাজকে আর কিছু করতে হবে না।

—ওদের নাগাল পাওয়ামাত্র ওদের নিয়ে কলকাতা বা অন্য কোন বড় শহরে চলে যাবেন। খুব সাবধান, উইচ হান্টিংয়ে জোট বেঁধেছে সব আদিবাসী, আদিবাসীদের মধ্যে যারা শিক্ষিত তাদের সমর্থনও পাচ্ছে তারা।

—শিক্ষিতরাও ডাইনীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে! আমার চোখদুটি বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

—এদের রক্তের মধ্যে মিশে আছে এই বিশ্বাস। বললে হয়তো আপনি বিশ্বাস করবেন না, যারা আদিবাসী নয়, এদের সংস্পর্শে এসে তারাও বিশ্বাস করে যে ডাইনীরা আছে।

ইতিমধ্যে হিমানী ট্রে-তে ক'রে আমাদের জন্য চা ও জলখাবার নিয়ে এলেন, তাঁর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে পূর্ণেন্দু বললেন, আমার স্ত্রী হিমানীও আজকাল বিশ্বাস করতে শুরু করেছে··তার ধারণা সে নিজেই বুঝি—

—আঃ, কী যে বলো তার ঠিক নেই! আরক্ত মুখে ধমক দিয়ে উঠলেন হিমানী।

—ডাইনীদের লক্ষণ কী জানেন তো? হিমানীর ধমকে কান না দিয়ে পূর্ণেন্দু ব'লে চলেন, ডাইনী হচ্ছে—

হিমানীর মুখচোখে ফুটে ওঠা অস্বস্তির লক্ষণ দেখে পূর্ণেন্দুর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আমি বললাম, আমি সব জানি পূর্ণেন্দুবাবু—আপনাকে আর বলতে হবে না।

—এই যে হিমানী আমাকে ছেড়ে থাকতে পারে না, ছেলে-মেয়েদের হোস্টেলে রেখে আমাকে নিয়ে প'ড়ে আছে এখানে, আমাকে এক মুহূর্তও চোখের আড়াল হ'তে দেয় না, এ সবই নাকি ডাইনীর লক্ষণ। মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে বললেন পূর্ণেন্দু।

—ওগো তোমার দুটি পায়ে পড়ি, হিমানী ব্যাকুল স্বরে ব'লে উঠলেন, তুমি থাম....

—থামতে পারি, যদি তোমার মন থেকে এই ধারণাটা মুছে ফেলতে পার পুরোপুরি···

—আমার যে ভীষণ ভয় করে গো! হিমানী কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন, আমার মনে হয় বুঝি সত্যিই তোমার রক্ত শুষে নিচ্ছি পিশাচীর মত···

কথাটাকে ঘুরিয়ে নেবার জন্য আমি ট্রে-তে সাজানো খাদ্যদ্রব্যের দিকে হিমানীর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বললাম, পরোটার সঙ্গে কিসের মাংস দিয়েছেন মিসেস সেন?

—খরগোশের মাংস। হিমানী জবাব দিলেন, খেয়ে দেখুন, খারাপ লাগবে না।

—তার সঙ্গে ওটা কী?

—ওটা হচ্ছে কোন্দোর পায়েস।

—গোবিন্দভোগ চালের পায়েসের চেয়েও উপাদেয়। পূর্ণেন্দু বললেন, আমি নিজে চালের চেয়ে কোন্দোই বেশি পছন্দ করি—কোন্দোর ভাত, পায়েস এইসব খাই। আচ্ছা হিমানী, আজ ভোরে আমি যে নিজের হাতে গোটা-দুই সোনা ব্যাঙ কেটে দিলুম, তার রোস্ট করবে না?

—সে কি আর ওঁরা খেতে পারবেন! ব'লে দ্বিধাগ্রস্তের মতন হাসলেন হিমানী।

—নিশ্চয়ই পারবেন। পৃথিবীর সেরা মাংস হল সোনা ব্যাঙ-এর মাংস। বুঝলেন রায় সাহেব, পৃথিবীর যাবতীয় পশু-পাখীর মাংস আমি খেয়েছি—তাদের মধ্যে সবচেয়ে উপাদেয় হল সোনা ব্যাঙ আর সবচেয়ে অখাদ্য হল বনবেড়াল···

—সাপের মাংস খেয়েছেন আপনি? আমি প্রশ্ন করলাম।

—নিশ্চয়ই। পূর্ণেন্দু জবাব দিলেন, ফণাটা কেটে বাদ দিয়ে খেতে হয়। কাছিমের মাংসের মতই উপাদেয়।

—এ-সব আপনিও খান নাকি? হিমানীর দিকে তাকিয়ে আমি প্রশ্ন করলাম।

—না, না। হিমানী শিউরে ওঠেন: এ-সব কি কোন মেয়ে-মানুষ খেতে পারে? তবে ওঁর জন্য রান্না ক'রে দিই···

—সত্যি সত্যিই সোনাব্যাঙের রোস্ট করবেন নাকি আজ? ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করি।

—নিশ্চয়ই করবে। উত্তরে হিমানী কিছু বলার আগেই পূর্ণেন্দু বললেন, খেয়ে দেখবেন, এর চেয়ে সুখাদ্য পৃথিবীতে আর নেই।

—তা হলে অনুমতি করুন, এই ব্রেকফাস্ট খেয়েই বিদায় হই আমরা···

—আমি কিন্তু বিদায় হব না। জোহান মৃদু হেসে বললে, ব্যাঙের মাংসের ওপরে আমাদের লোভ আছে।

—আমি তাহলে আপনার সঙ্গেই খাব। হিমানীর দিকে তাকিয়ে বললাম আমি।

—হ্যাঁ, সেই ভাল। পূর্ণেন্দু হেসে ফেলে বললেন, হিমানীর সঙ্গে আপনি সাত্ত্বিক পান-ভোজন করুন, জোহান ও আমি মহুয়ার রস দিয়ে ব্যাঙের মাংস খাব। তবে একটা কথা রায় সাহেব, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে এই সাত্ত্বিকতা খুব বেশিদিন বজায় রাখতে

পারবেন না। এমন একদিন আসবে, যখন সাপ-ব্যাঙ খেয়েই থাকতে হবে···

সেদিন অনেক রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর গেস্ট রুমে খিল দিয়ে বসেছি। জোহান প্রায় অচেতন হয়ে ঘুমোচ্ছে, মাত্রাতিরিক্ত মহুয়া রসের প্রতিক্রিয়া। ওর এই নিশ্চেতন নিদ্রা দেখে আমার নিজের ঘুম আসতে চায় না, তুজনের একই সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়াটা নিরাপদ ব'লে মনে হয় না আমার। পূর্ণেন্দু ও হিমানী তুজনেই অবশ্য ষোল আনা নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে বলেছিলেন আমাকে। বন্য জানোয়াররা কাছাকাছি থাকলেও আমাদের কোন ক্ষতি নাকি করবে না—বনের পশুদের প্রতি পূর্ণেন্দু ও হিমানীর অহিংস মনোভাবের প্রতিদানে তাদের কাছ থেকে শতকরা একশোভাগ অহিংসার প্রত্যাশা তাঁরা রাখেন। কিন্তু পূর্ণেন্দু ও হিমানীর মত বনের পশুদের পুরোপুরি বিশ্বাস করতে আমি পারিনে, একটা অস্বস্তি-জনক অনুভূতি মনের মধ্যে থেকে শিউরে উঠতেই থাকে। তা ছাড়া, এখানকার বাতাসেও যেন উত্তেজনার উপকরণ ছড়িয়ে আছে। বাইরে বনের গাছপালাকে কাঁপিয়ে দক্ষিণা বাতাস বইছে, বাতাসের ছোঁয়া লেগে ঝরা শুকনো পাতায় মর্মরধ্বনি জাগে—তার সঙ্গে সুর মেলায় রাতজাগা পাখি ও ঝিঁঝি পোকার ডাক। তাদের মধ্য দিয়ে বনের মর্মবাণী যেন ব্যক্ত হয়ে উঠছে। শুনতে শুনতে আমার বুকের ভেতরটা শিউরে উঠতে থাকে।

হঠাৎ দরজায় ঠুক ঠুক শব্দ। দরজার ওপরে মৃতুমন্দ আঘাত হানছে কেউ। হয়তো পূর্ণেন্দু এসেছেন—আমারই মত হয়তো তাঁরও ঘুম আসছে না। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিই।

কিন্তু দরজা খুলতেই বাইরের অন্ধকার যেন বিভীষিকার রূপ ধ'রে দাঁড়াল আমার সামনে। একটা খুব বড়ো আকারের ভালুক টলতে টলতে ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে। তারপর নাচতে শুরু ক'রে দিল হেলতে তুলতে। দেখেই বুঝতে পারি, মহুয়া ফুল খেয়ে মাতাল হয়েছে।

মহুয়ায় মাতাল ভালুকের আক্রমণ করার ক্ষমতা থাকে না, কিন্তু তবু ভয় পেয়ে যাই আমি। বেরিয়ে আসি ঘর থেকে।

কিন্তু ঘরের বাইরে আর একটি ভালুককে দেখতে পাই। অদূরবর্তী মহুয়া গাছের তলায় দাঁড়িয়ে সে নাচছে। পুব আকাশে কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চাঁদ অন্ধকারকে ফিকে ক'রে দিয়েছে—মৃদু জ্যোৎস্না বনময় আলো-ছায়ার জাল বুনে চলেছে। মহুয়াগাছের তলায় বাতাসে কাঁপতে থাকা গাছের ডালপালার ছায়ার সঙ্গে তাল রেখে নেচে চলেছে ভালুক। মনের আনন্দে নেচে চলেছে ভালুকটা, কিন্তু আমার মনে ভয় হয়। তাড়াতাড়ি স'রে পড়ি ওখান থেকে।

বেশ কিছুটা তফাতে গিয়ে ভালুকের নাচ দেখতে দেখতে হঠাৎ জোহানের কথা মনে হ'ল—অন্য ভালুকটার সঙ্গে ঘরের মধ্যে একা রয়েছে সে। ঘুমে অচেতন জোহানের কোন অনিষ্ট করেনি তো সে? ভালুক সম্বন্ধে শিকারী বা বনের মানুষদের যা অভিজ্ঞতা তাতে মনে হয়, অকারণ হিংস্রতাই ভালুকের স্বভাব। তাই যদি হয়, এতক্ষণে হয়তো সে জোহানের ওপরে হামলা করেছে এবং তাদের স্বভাবসিদ্ধ নৃশংসতার সঙ্গে তার চোখ, নাক বা কান উপড়ে ফেলেছে।

এ-সব কথা ভাবতে গিয়ে শিউরে ওঠে আমার সর্বাঙ্গ। কিন্তু এখন আমার কী কর্তব্য ভেবে পাই না।

অগত্যা শেষ পর্যন্ত পূর্ণেন্দুর শরণাপন্ন হব ব'লে ঠিক করলাম। এই সব ভালুকের স্বভাব ও প্রকৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল পূর্ণেন্দু হয়তো অনায়াসেই জোহানকে ভালুকের খপ্পর থেকে উদ্ধার ক'রে আনতে পারবে।

যেমনি ভাবা, তেমনি কাজ। কিন্তু পূর্ণেন্দুকে পাই না তার ঘরে—হিমানীও নেই। দুজনে মিলে কোথাও গিয়েছে বোধ হয়। কিন্তু এত রাতে কোথায় গেল তারা ত বুঝব কী করে?

ততক্ষণে কৃষ্ণপক্ষের আধখানা চাঁদের ফালি আকাশের মাঝামাঝি পর্যন্ত উঠে গিয়েছে।

গাছের নীচে ছায়ার আলপনা। সে আলো আকাশ জুড়ে ঐক্যমন্ত্রের মতো ব্যক্ত, বনের মধ্যে ছায়ার সঙ্গে তার নিবিড় মিতালি। আলোছায়ার স্পন্দনের সঙ্গে সুর মেলায় গাছের পাতার মধ্যে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস। আমার মনে হচ্ছে যেন উপনিষদের মন্ত্র সোচ্চার হয়ে উঠেছে আমার চোখের সামনে। "যো বিশ্ব ভুবনমাবিবেশ"—সেই বিশ্বদেবতাকে যেন বনের মধ্যে দেখতে পাই।

বিশ্বদেবতাকে প্রত্যক্ষ করলেও পূর্ণেন্দুকে দেখতে পাই নে। ইচ্ছেমত খোঁজাখুঁজি করার সাহসও নেই, কারণ চারিদিকে ভালুক। যে ভালুকদুটিকে দেখতে পাচ্ছি তারা ছাড়াও অনেক ভালুক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বনময়। চোখে না দেখেও তাদের সান্নিধ্য অনুভব করি।

হঠাৎ শুকনো পাতার শব্দ ওঠে, অদূরে একটি লতা-ঝোপে কাঁপন জাগে। পরমুহূর্তে তার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসেন পূর্ণেন্দু ও হিমানী। আদিবাসীদের মত খাটো খাটো কাপড় পরেছে দুজনে, গায়ে জামা বা অন্তর্বাস নেই। পূর্ণেন্দুর কালো বলিষ্ঠ দেহটা জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছে, পৌরুষের দীপ্তি বিকীর্ণ করতে করতে এগিয়ে আসছে সে। পূর্ণেন্দুর পৌরুষের চেয়েও বিস্ময়কর হিমানীর যৌবনের উদ্ধত আত্ম-প্রকাশ। তার খাটো শাড়ি অন্তর্বাসের বন্ধনমুক্ত যৌবনপুষ্ট শরীরটাকে পুরোপুরি বেষ্টন করতে পারেনি। দেহের অনাবৃত অংশগুলি জ্যোৎস্নাতে উদ্ভাসিত, বনের কালো পটে আঁকা শুভ্র সমুজ্জ্বল ছবি যেন!

আমাকে দেখে পূর্ণেন্দুর মুখে মৃদুমন্দ হাসি ফুটে উঠলেও হিমানী মুখ তুলে তাকাতেই পারেন না— তিনি ছুটে পালালেন তাঁদের ঘরের দিকে।

—কী ব্যাপার? আমার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন পূর্ণেন্দু: এত রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছেন কেন?

—ঘরের মধ্যে ভালুক ঢুকেছে যে! আমি ব্যাকুল স্বরে ব'লে উঠলাম, মহুয়া-মাতাল ভালুক···

—মাতাল ভালুককে ভয় কিসের ! আসুন আমার সঙ্গে···

ব'লে গেস্ট রুমের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়লেন পূর্ণেন্দু। তাঁকে অনুসরণ ক'রে ঘরে ঢুকে থতমত খেয়ে দাঁড়াই। ভালুকটা শুয়ে পড়েছে আমার বিছানায়—জোহানের মতই ঘুমে অচেতন।

ভালুকটির দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে পূর্ণেন্দু বললেন, ওকে তো এখন সরানো যাবে না এখান থেকে—আপনি বরঞ্চ ড্রইংরুমে গিয়ে শুয়ে পড়ুন···

—ভালুকের কাছাকাছি শুয়ে থাকব ! আমি চমকে উঠে বললাম।

—কোন ভয় নেই—আমি জানি, মাতাল ভালুকের মধ্যে ছিঁটে-ফোঁটাও হিংস্রতা থাকে না···।

১১

পরদিন ভোরে উঠেই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, এমন সময় ঘরে ঢুকলেন পূর্ণেন্দু।

—ভালুকটা নেই তো? ঘরে ঢুকেই প্রশ্ন করলেন তিনি।

—না। আমি জবাব দিলাম, ভোর হবার আগেই বেরিয়ে গিয়েছে। এবার আমরাও বেরিয়ে পড়ব ভাবছি।

—আপনাদের সঙ্গে আমরাও যাব, মানে হিমানী ও আমি। আসুন, ব্রেকফাস্ট তৈরি—ব্রেকফাস্ট খেয়েই বেরিয়ে পড়ব।

—আপনারা যাবেন! আমি সোচ্ছ্বাসে ব'লে উঠলাম, কিন্তু আমাদের পথ দেখাবার জন্য এই কষ্টটুকু নাই-বা করলেন। যে ক'রে হোক পথ চিনে নিতামই আমরা।

—আপনাদের পথ দেখাবার জন্য নয়, আমাদের নিজেদের প্রয়োজনেই যাচ্ছি। প্রতাপপুরের কাছে বেলজিয়ান মিশনারী ফাদার ফ্রান্সিস আমাদের জন্য কিছু বিরলশ্রেণীর ওষধি সংগ্রহ ক'রে রেখেছেন যা বনরাজ মারফৎ পাঠাতে তিনি চান না। সেগুলো নিয়ে আসতে যাচ্ছি ··

পূর্ণেন্দুর আস্তানা থেকে রওনা হতে সকাল প্রায় ন'টা হল। আর আমাদের ঘোড়াদুটির সঙ্গে যোগ দিল আরও দুটি তেজী বড়ো আকারের ঘোড়া—পূর্ণেন্দু ও হিমানী চেপে বসলেন তাদের পিঠে। পূর্ণেন্দুর মত হিমানীরও পরনে খাকী ব্রিচেস ও জ্যাকেট, কোমরে রাইফেলের কার্তুজ বসানো বেল্ট এবং কাঁধে রাইফেল। অধিকন্তু বেল্টের মধ্যে একটি পিস্তলও গোঁজা আছে। রাইফেল ও পিস্তল ছাড়া একটি বারো 'বোর' বন্দুকও বহন করছিলেন পূর্ণেন্দু।

জোহানের কাঁধে একটি গাদা বন্দুক ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র

আমাদের সঙ্গে নেই দেখে পূর্ণেন্দু বিস্ময় প্রকাশ করলেন। গম্ভীর মুখে বললেন, উইচ-হাণ্টার, মানে ডাইনী নাশের কাজে যারা বেরিয়েছে তাদের সঙ্গে আপনারা দুজনে মাত্র একটি বন্দুক দিয়ে লড়বেন কী করে?

—লড়তে তো আমরা চাই না, শুভ্রজ্যোতি ও মানকীকে নিয়ে শুধু পালিয়ে যেতে চাই। আমি বললাম।

—পালিয়ে যেতে গিয়ে যদি ওদের খপ্পরে প'ড়ে যান। ব'লে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকালেন পূর্ণেন্দু।

উত্তরে কিছু বলতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকি পূর্ণেন্দুর মুখের দিকে।

—আপনার কোন ভয় নেই মিস্টার রায়। মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে হিমানী বললেন, আমরা লড়ব আপনাদের হয়ে। সেইজন্যেই যাচ্ছি আপনাদের সঙ্গে।

—কিন্তু মিস্টার সেন যে বললেন আপনারা ফাদার ফ্রান্সিস-এর কাছ থেকে—

—আমাদের লোকজনদের এই কথা বলা হয়েছে ব'লেই উনি বললেন। হিমানী আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, এখানকার আদিবাসীদের মত আমাদের লোকজনরাও ডাইনী হিসেবে মানকীকে ও ডাইনীর খপ্পরে পড়া পুরুষ হিসেবে শুভ্রজ্যোতিকে আগুনে পুড়িয়ে মারতে চায় কিনা·

—চুপ। মৃদু ধমক দিয়ে উঠলেন পূর্ণেন্দু, এ নিয়ে কোন কথা এখানে নয়···

—এখানে কেউ নেই ব'লেই বলছিলাম। থতমত খেয়ে বললেন হিমানী।

—কেউ নেই জানলে কী ক'রে! ফিসফিসিয়ে বললেন পূর্ণেন্দু, বনের মধ্যে হয়তো ওত পেতে আছে ওরা···

গভীর থেকে গভীরতর বনের মধ্যে এগিয়ে যাই আমরা। হাতির পায়ে পায়ে তৈরী এই পথটি (পূর্ণেন্দু যার নাম দিয়েছেন

'হাতি পথ') খুব স্পষ্ট নয়, গাছপালা ও লতাঝোপের নিরবচ্ছিন্নতার মধ্যে তা হারিয়ে গিয়েছে।

—বনরাজ ছাড়া অন্য কোন হাতি এ পথে যাতায়াত করে না ব'লে পথটা বনের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। পূর্ণেন্দু বললেন, তবে নিয়মিত জড়িবুটি খুঁজতে বেরোই ব'লে পথটা আমি চিনি। আর চেনে হরিণের পাল ও বুনো শবররা।

পূর্ণেন্দুকে অনুসরণ ক'রে এ পথ ধ'রে বেশ কিছুটা দূর একটানা এগিয়ে যাই আমরা। তারপর পূর্ণেন্দুর সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়াই একটি পাহাড়ী নদীর ধারে। পথটা নদীর মধ্য দিয়ে জলের নীচে প্রচ্ছন্ন থেকে ওপারে ফুটে উঠেছে খাড়া পাড়ের গা বেয়ে।

নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করেন পূর্ণেন্দু। বনের মধ্যে পথটা চিনলেও জলের মধ্যে উহ্য পথের নিশানা বোধ হয় আন্দাজ করতে পারেন না তিনি।

—নদীর মধ্যে পথটা খুব বিপজ্জনক। পূর্ণেন্দু বললেন, মানে পথ থেকে একচুল এদিক-ওদিক হ'লেই গর্ত বা চোরাবালির মধ্যে প'ড়ে যাব। গর্ত মানে রীতিমত বড়ো গহ্বর। এখন হরিণ বা অন্য কোন জন্তুর জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই—জলের তলায় পথের হদিস ওরাই পারবে দিতে···

—ওরা যদি না আসে! আমি বললাম।

—আসতেই হবে—মানে আসবেই।

এল! একটি চিতল হরিণ। কিন্তু জলে না নেমে পালিয়ে গেল—আমাদের দেখে বোধ হয় ভয় পেয়েছিল।

আবার অপেক্ষা। ঘোড়ার পিঠে চেপেই অপেক্ষা করি--কারণ পথের হদিস পাওয়ামাত্র নদী পার হতে হবে আমাদের।

হরিণ আর এল না, নদীর ওপারে দেখা দিল একটা বাচ্চা-ভালুক। ছুটে আসছে সে এদিকে—হয়তো কোন জন্তু তাড়া করেছে তাকে।

—ভালুকটা নদী পার হওয়ামাত্র আমরা নদী পার হব। পূর্ণেন্দু

চাপা উত্তেজিত স্বরে ব'লে উঠলেন, যে পথে সে আসবে, ঠিক সেই পথেই যেতে হবে—একচুল এদিক-ওদিক হ'লে চলবে না।

ভালুক ছুটে এল তীরের বেগে—সঙ্গে সঙ্গে ভালুকটার প্রদর্শিত পথেই ছুটল আমাদের ঘোড়া, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই পার হলাম আমরা নদীটা।

আমরা ওপারে পৌঁছতেই মূর্তিমান বিভীষিকার মত ছুটে এল একটা প্রকাণ্ড ভালুক। তার চোখদুটি জ্বলছে দুরন্ত আক্রোশে, আমাদের দিকে ভ্রূক্ষেপও না ক'রে ছুটে যাচ্ছে বাচ্চা-ভালুকটার দিকে। নদী পেরিয়ে বিদ্যুৎবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাচ্চা-ভালুকটির ওপরে।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে গুলি করলেন পূর্ণেন্দু। অব্যর্থ নিশানা —রাইফেলের গুলি সরাসরি বড়ো ভালুকটির মস্তিষ্ক বিদীর্ণ করল। চোখের নিমেষে লুটিয়ে পড়ল সে মাটিতে। বাচ্চা-ভালুকটিকে আর দেখা গেল না, বোধ হয় সে অক্ষত দেহেই পালিয়েছে।

—ক্যানিব্যাল ভালুক। নিহত ভালুকটির দিকে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন পূর্ণেন্দু, ঐ বাচ্চা-ভালুকটিকে মারতে যাচ্ছিল তার মাংস খাবার জন্য।

—ভালুকের মাংস ভালুক খায় এমন তো কখনো শুনিনি! আমি অবাক হয়ে বললাম, তা ছাড়া ভালুককে নিরামিষাশী বলেই জানতাম···

—আমিও তাই জানতাম—ভালুক ভালুকের মাংস খায় এও আমার কল্পনার বাইরে ছিল। কিন্তু এই বনের মধ্যে বাস করতে করতে নিজের চোখে ওদের মেরে খেতে দেখেছি,—মাংসের স্বাদ যে ভালুক পেয়েছে তার অন্য কোন খাদ্য রোচে না। মাংস খেতে খেতে নিজের জাতভাইদের মাংসের স্বাদ নেবার প্রবৃত্তি সব জানোয়ারেরই হওয়া স্বাভাবিক—মাংসাশী ভালুকও তার ব্যতিক্রম নয়। আমার শিকার করা ভালুকের মৃতদেহকে ভালুকের খাদ্য হতে বহুবার দেখেছি। তা ছাড়া, নিজের সন্তানকে মেরে খাবার প্রবৃত্তি যে-কোন

পুরুষ জন্তুর মধ্যে দেখা যায়। ক্যানিব্যালিজম্ সব জানোয়ারের মধ্যেই আছে, মানুষের মধ্যেও···

—এই বনের মধ্যে মানুষ-খেকো মানুষ দেখেছেন নাকি?

—দেখেছি বইকি। বনের বাসিন্দাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের দেবতার থানে মানুষ বলি দেয়, বলি দেওয়া মানুষের মাংস তারা প্রসাদ-হিসেবে পেয়ে থাকে।

—আচ্ছা পূর্ণেন্দুবাবু, আপনার শিকার করা এই ভালুকটির মাংস খেতে ওর জাতভাইরা কি এগিয়ে আসবে?

—সুযোগ পেলেই আসবে। কিন্তু সুযোগ কি আর আসবে? কারণ···

পূর্ণেন্দুর মুখের কথা মুখেই থেকে যায় মাদলের আওয়াজে। শব্দটা এদিকে খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে।

—ওরা আসছে। পূর্ণেন্দু মৃদু হেসে বললেন, কাজেই এই ভালুকটার জাতভাইরা আর তার মাংস খাবার সুযোগ পাবে না।

খরশনা ও কুচিলতার ঘন ঝোপ ফুঁড়ে বেরিয়ে এল চারজন কুচকুচে কালো আদিবাসী।

নেংটির মত খাটো ময়লা কাপড় ছাড়া পরনে তাদের আর কিছুই নেই। দুজনের কাঁধে দুটো মাদল, প্রত্যেকের কোমরে একটা ক'রে টাঙি। মাদল বাজাতে বাজাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা ভালুকটির মৃতদেহের ওপরে।

—এরা হচ্ছে শবর শ্রেণীর একটি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। ফিসফিসিয়ে বললেন পূর্ণেন্দু। শিকার এদের জীবিকা হলেও শিকারীদের পেছনে পেছনে এরা ঘুরে বেড়ায়। যে-কোন জানোয়ারের মাংস সামান্য ঝলসেই এরা খেয়ে ফেলে।

এদের কথা ভ্যালেনটাইন বল্ লিখেছিলেন তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে। বল্-সাহেবের শিকার করা এক জোড়া ভালুকের ছাল ছাড়িয়ে মাংস কেটে নিয়েছিল এরা। ভালুকদুটির দেহের সামান্য অংশই কেটে নিয়েছিল, বাকিটা রেখে গিয়েছিল লতাঝোপের পাশে। খুব ভাল

ক'রে সাজিয়ে রেখেছিল—বল্-সাহেবের মনে হয়েছিল যেন তাদের দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা পুজোর উপচার। বল্-সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে একজন আদিবাসী বলেছিল, গভীর রাত্রে দেবতা নিজে এসে গ্রহণ করবেন···

বনের দেবতাকে স্বচক্ষে দেখার প্রবল ইচ্ছে হয়েছিল বল্-সাহেবের। মনের এই গোপন ইচ্ছার কথা তিনি আদিবাসীদের কাছে প্রকাশ করেননি, কারণ বনের এই দেবতা সম্পর্কে আদিবাসীদের ভয়ের কথা তিনি জানতেন। আদিবাসীরা চিহোড় লতার ঝোপের পাশে ভালুকের মাংস সাজিয়ে রেখে চলে গেল। তারপর তাঁর লোকজনের সাহায্যে অদূরবর্তী একটি অর্জুন গাছের ডালে মাচান বেঁধে ফেললেন তিনি। সন্ধ্যার পর বসলেন ঐ মাচানের ওপর তাঁর বড়ো ম্যানচেস্টার রাইফেল ও দো-নলা বন্দুক নিয়ে। তাঁর লোকজনদের কেউ-ই তাঁর সঙ্গে বসতে সাহস পেল না, কারণ বনের দেবতাকে চোখে দেখাও স্থানীয় আদিবাসীরা পাপ ব'লে মনে করত।

গভীর রাতে ঐ ঘন বনের মধ্যে একা বসে থাকা যতই ভয়াবহ হোক, ভয় পাননি বল্-সাহেব। জ্যোৎস্না-পুলকিত অরণ্যের গাছ পালার মধ্যে বনদেবতার প্রসন্নতা যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল—বল্-সাহেবের মনে হয়েছিল বনদেবতা যেন সম্ভাবিত সমস্ত অনিষ্ট থেকে তাঁকে রক্ষা করবেন।

বনদেবতা দেখা দিলেন গভীর রাতে। একেবারে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন লতাঝোপের আড়াল থেকে। একটি খুব বড়ো আকারের বাঘ। এত বড়ো বাঘ এর আগে কখনো দেখেননি বল্-সাহেব। বল্-সাহেবের হঠাৎ মনে হল, বাঘটা শুধু বড়ো নয়, বুড়োও। তার চলার ভঙ্গীর মধ্যে সোচ্চার হয়ে উঠেছে তার বার্ধক্য।

ধীরে সুস্থে হেলতে দুলতে বাঘটা এগিয়ে এল ভালুকের মাংসের স্তূপের দিকে, তারপর মন দিল আহারে।

অনেকক্ষণ ছিল বাঘটা ওখানে। ধীরে সুস্থে অনেকক্ষণ ধ'রে সমাধা করল সে তার আহার-পর্ব। বল্-সাহেবের রাইফেলের এমনি

সহজ নাগালের মধ্যে ছিল যে, ইচ্ছে করলে এক গুলিতেই তার হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ করতে পারতেন তিনি। কিন্তু নিজেকে সংবরণ করেছিলেন তিনি সে রাতে! জ্যোৎস্নায় প্রদীপ্ত তার বিশাল দেহের জৌলুসের মধ্যে হয়তো এমন অপার্থিব দীপ্তি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিনি, যা সংহত করেছিল তাঁর শিকারের হিংস্র প্রকৃতিকে।

বনদেবতার আপ্যায়নের নাম ক'রে অথর্ব বৃদ্ধ বাঘের খোরাক জোটায় আদিবাসীরা। বনের পশু-শিকারে অক্ষম এইসব বাঘ নয়তো মানুষ খেকো হয়ে ওঠে। মানুষ দৈহিক শক্তিতে দুর্বল, দৌড়ে পালাবার ক্ষমতাও তার নেই—সহজ শিকার হয় সে এইসব অক্ষম বাঘের। এদের ক্ষুধা মিটিয়ে আদিবাসীরা জীবন বাঁচায় নিজেদের।

পূর্ণেন্দুর শিকার করা ভালুকের ছাল ছাড়িয়ে তার মাংস কাটছে আদিবাসীরা টাঙি দিয়ে, খণ্ড-বিখণ্ড করছে তার দেহের মাংসপেশীগুলো—হঠাৎ আমার মনে হল, তাদের একশো বছর আগেকার প্রথা কি তারা মেনে চলে এখনো? ব্যাঘ্র-দেবতার উদ্দেশ্যে পূজার উপচার কি তারা সাজিয়ে রাখে?

আমার এ প্রশ্নের জবাবে পূর্ণেন্দু বললেন, পূজার উপচার অবশ্যই সাজিয়ে রাখে—কিন্তু কোন্ দেবতার ভোগে লাগে তা তিনি বলতে পারবেন না, কারণ বাঘের সংখ্যা কমে এসেছে খুব।

—এখানে অপেক্ষা করলে তার দেখা হয়তো পেয়ে যেতে পারি, আমি বললাম।

—তা পেয়ে যেতে পারি, কিন্তু তার জন্য হয়তো আমাদের রাত কাটাতে হবে এখানে।

—না না, রাত কাটানো চলবে না। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে আমাদের, সন্ধ্যার আগে হয়তো প্রতাপপুরে পৌঁছতেই পারব না।

১২

সত্যিই পৌঁছতে পারি না আমরা প্রতাপপুর। বিকেলের দিকে প্রতাপপুর থেকে মাইল চারেক দূরে একটি ভাঙা দুর্গের কাছে গিয়ে আমরা পৌঁছতেই আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল একজন বুড়ো ওঁরাও। উত্তেজিত স্বরে সে বললে, আর এগিয়ে যাবেন না—বনের মধ্যে আগুন লেগেছে।

বনের আগুন মানে দাবানল। ঝরাপাতা বা গাছ থেকে স্খলিত শুকনো ডালপালায় চৈত্র বা বৈশাখ মাসের নিষ্করুণ শুষ্কতার দরুন আগুন লেগে যায় এবং তা ছড়িয়ে পড়ে বনময়। আগুন অবশ্য এখন দেখা যাচ্ছে না—দিনের আলোয় চাপা পড়েছে, কিন্তু তার ধোঁয়ার আভাস গাছপালার নিরবচ্ছিন্ন সমাবেশের মাথায়।

ঘোড়ার পিঠ থেকে পূর্ণেন্দু নামলেন উত্তেজিতভাবে, রুদ্ধশ্বাসে বললেন, ঐ আগুনকে রুখতে হবে—নইলে সমস্ত বন পুড়ে যাবে।

—যাক পুড়ে! হিমানী পূর্ণেন্দুর দু'হাত নিজের দুটি হাত দিয়ে চেপে ধ'রে বললেন, এখন আমাদের কিছুই করার নেই—যাতে জীবন বিপন্ন হয় তেমন কিছুই তোমাকে করতে দেব না।

ওঁরাও বুড়ো হিমানীর দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, ঠিক বলেছ দিদি, ঐ আগুনের মধ্যে ঢুকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে কেউ-ই পারবে না, কারণ এ আগুন আদিবাসীরা লাগিয়েছে ডাইনী ও তার পুরুষটাকে পুড়িয়ে মারবার জন্য।

—অ্যাঁ, বলো কী! প্রায় সমস্বরে ব'লে উঠলাম আমরা।

—প্রায় পাঁচশো জন আদিবাসী ঘিরে ফেলেছে ওদের। ওঁরাও বুড়ো ব'লে চলে, মানে ঘিরে ফেলেছে ঐ আগুনটাকে। আগুনটাকে পেরিয়ে আসতে পারলেও ওদের ডিঙিয়ে আসতে পারবে না। ওদের দুজনকে বর্শা দিয়ে বেঁধে ফেলে আগুনে পুড়িয়ে মারবে ওরা—

—কী সর্বনাশ! আমি শিউরে উঠি। আমার শিহরণ হিমানীকেও স্পর্শ করে। একটা চাপা আর্তনাদ ফুটে ওঠে তাঁর কণ্ঠে।

পূর্ণেন্দু ওঁরাও বুড়োর মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি হেনে বললেন, ওরা দুজনে আছে ঝিমলী নামে হাতির পিঠে—ওদের সঙ্গে আছে দুর্ধর্ষ বনরাজ—এই দুটি হাতি মিলে বাঁচাবে ওদের।

—অসম্ভব। গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল ওঁরাও বুড়ো: হাতিরা আগুনকে বড়ো ভয় পায়। এ বনে যখন হাতি ছিল তখন বনের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে, হাতিদের চারপাশে আগুনের ঘেরাটোপ বানিয়ে হাতি ধরতেন সুরগুজার রাজাসাহেব।

আগুন জ্বালিয়ে হাতি ধরার বৃত্তান্ত ভ্যালেন্টাইন বল্-এর ভ্রমণকাহিনীতেও আছে। সুরগুজার রাজা বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ সিং এই বনের মধ্যেই আগুনের ঘেরাটোপ সৃষ্টি করতেন বুনো হাতির পালের চারপাশে। আগুনের বৃত্তকে ঘিরে থাকত তাঁর পোষা হাতির দল। আগুন নিভে যাবার পর পোষা হাতিরা বুনো হাতিদের বেষ্টন ক'রে ফেলত এবং মাহুতরা শিকল পরিয়ে দিত বুনো হাতিদের পায়ে। তারপর বন্দী হাতিদের নিয়ে আসা হত এখানে। এই দুর্গের পাঁচিল তখন অক্ষত ছিল, বুনো হাতির দলকে এখানে আটকে রেখে পোষ মানাবার চেষ্টা করা হত।

বন্য হাতিদের পোষ মানাবার প্রক্রিয়াগুলি ছিল খুবই নিষ্ঠুর। প্রথমতঃ অঙ্কুশের আঘাত হেনে দৈহিক নির্যাতন, দ্বিতীয়তঃ খেতে না দেওয়া এবং তৃতীয়তঃ অবিশ্রান্ত মাদল বাজিয়ে তাদের জাগিয়ে রাখা। এমনি ক'রে ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে পড়ত তারা এবং বশ্যতা স্বীকার করত নির্যাতনকারী মানুষের কাছে।

বল্-সাহেব প্রায় একমাস ক্যাম্প করেছিলেন এখানে। ঐ এক মাসে প্রায় একশোটি বুনো হাতিকে পোষ মানিয়েছিলেন বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ সিং। তখন হাজার হাজার হাতি ছিল রাঁচি সুরগুজা ও রেওয়া জেলা জুড়ে। এখন সামান্য কয়েকটি মাত্র অবশিষ্ট আছে।

তাদের অবশ্য দেখা যায় না—লোকালয়ের ধারেকাছেও ঘেঁষতে চায় না তারা।

হিমানী ব্যাকুল স্বরে ব'লে উঠলেন, ওদের দুজনকে কী ক'রে এই আগুন থেকে উদ্ধার করা যায়, সেই কথা ভাবো।

—উদ্ধার ঝিমলী ও বনরাজই করবে। পূর্ণেন্দু গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন।

—ঝিমলী ও বনরাজ কিছুই করতে পারবে না। ঝাঁজালো স্বরে ব'লে উঠল ওঁরাও বুড়ো, আমি আগেই বলেছি, আগুনকে ওরা ভয় পায়।

—আগুন নিভে গেলে আদিবাসীদের আক্রমণ থেকে ওদের বাঁচাবে ওরা—

—পারবে না। ওঁরাও বুড়োর কণ্ঠস্বরে চাপা হিংস্রতা ঝিলিক দিয়ে ওঠে: আগুন নিভলে সবার আগে ওদের মারবে ওরা—তারপর ঐ ডাইনী ও ডাইনীর পুরুষটাকে···

—অসম্ভব। পূর্ণেন্দু পাথরের মত জমাট-বাঁধা গলায় বললেন, বনরাজ বনের রাজা—আর ঝিমলীকে বনরাজ তার রাণী করেছে—ওদের গায়ে হাত দেবার ক্ষমতা কারুর নেই···

—পাঁচশো জন আদিবাসীর সঙ্গে লড়বে তোমাদের ঐ হাতি-দুটো! তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে ওঁরাও বুড়ো।

—বুড়ো ঠিকই বলছে গো। হিমানী কাতর স্বরে ব'লে উঠলেন, দুটো হাতি পাঁচশো জন আদিবাসীর সঙ্গে লড়বে কী ক'রে?

উত্তরে একটু কেবল হাসলেন পূর্ণেন্দু, কোন কথা বললেন না।

পূর্ণেন্দুর এই নিশ্চিন্ততা, বনরাজের ক্ষমতার ওপরে অস্বাভাবিক আস্থা আমাকে বিস্মিত করে। আমি বললাম, আমাদের দিক থেকে কি কিছুই করার নেই?

—না। পূর্ণেন্দু জবাব দিলেন, যা করার ঝিমলী ও বনরাজই করবে···

ইতিমধ্যে বেড়ে যায় আগুনের তেজ—বাতাসে তার হল্কা ভেসে

আসে, ফোস্কার মত লাগে আমাদের গায়ে। বনের মাথায় গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে ওঠে ধোঁয়ার কুণ্ডলি।

হঠাৎ মাটি কাঁপিয়ে ধুপধাপ শব্দ ওঠে, কারা যেন ছুটে আসছে এদিকে।

—স'রে দাঁড়াও তোমরা শিগগির। চিৎকার ক'রে ওঠে ওঁরাও বুড়ো, ওরা আসছে···

—কারা?

হিমানীর প্রশ্নের জবাবে ওঁরাও বুড়ো কিছু বলবার আগেই ছুটে এল একপাল বুনো মোষ। সাধারণ মোষের চেয়ে আকারে বড়ো এবং গড়নে বলিষ্ঠতর হ'লেও আগুনের ভয়ে কাতর। বুনো মোষের দলের পেছনে পেছনে এক জোড়া চিতাবাঘ তাদের চারটি শাবক নিয়ে, তারপর চিতল হরিণের দল। সবার শেষে জলের স্রোতের মত নেমে আসে হাজার হাজার ইঁদুর···

—তাড়াতাড়ি গাছের ওপর উঠে পড় তোমরা! ওঁরাও বুড়ো আর্তস্বরে ব'লে উঠল, নইলে ইঁদুর-চাপা প'ড়ে মরবে···

বলতে বলতে সে নিজেও উঠে পড়ল একটি মহুয়াগাছের ওপরে। তাকে অনুসরণ ক'রে ঐ একই গাছে আমরাও উঠলাম। হিমানীকে প্রায় পাঁজাকোলা ক'রে গাছে তুললেন পূর্ণেন্দু।

একসঙ্গে এত ইঁদুর আগে কখনো দেখিনি। ঠিক যেন বন্যার ঢলের মত সম্মিলিত ভাবে এগিয়ে আসছে। ভয়ে আমাদের ঘোড়াগুলো চিঁহি-চিঁহি ক'রে ওঠে—তারা লাফিয়ে উঠে পড়ে দুর্গের একটি ভাঙা পাঁচিলের ওপরে—

ইঁদুরের স্রোত নেমে যেতে প্রায় মিনিট কুড়ি লেগে গেল। গাছ থেকে নেমে এসে পূর্ণেন্দু মুচকি হেসে বললেন, ইঁদুরের ভয়েই আমরা আধমরা—কী অবস্থা আমাদের বিবেচনা ক'রে দেখুন···

পূর্ণেন্দু যাদের বিবেচনা ক'রে দেখতে বলছেন তাদের অবস্থা তাঁর চেয়েও সঙ্গীন। হিমানী তো প্রায় মূর্ছিত, জোহান ও আমি দুজনেই দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে ওঠা মানুষের মতোই স্তম্ভিত। কাজেই কারুর

মুখেই কোন কথা সরে না। ইঁদুরের মত ক্ষুদ্র প্রাণীও যে কতখানি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে হাতে-নাতে তার প্রমাণ পেয়ে আমি বিমূঢ়।

এই প্রসঙ্গে আমার মনে হল পঙ্গপাল ও পিঁপড়ের কথা। সম্মিলিতভাবে তারাও ভয়ঙ্কর। পঙ্গপালের পাল এক সঙ্গে হাজার হাজার একর জমির শস্য নাশ করে—কোটি কোটি পিঁপড়ের যৌথ অভিযান বড়ো বড়ো জীবজন্তুকেও নিঃশেষ ক'রে ফেলতে পারে।

ক্রমশঃ সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। ছায়া ঘনায় বনে বনে। অন্ধকারের কালো পটে বনের আগুন যেন রক্ত-রঙিন ছবির মত ফুটে ওঠে। আর সামনের পাহাড়ের একটা বিপুল অংশকে তা ঘিরে ফেলেছে একটা অতিকায় বৃত্তের মত। পাহাড়ের বুক ফুঁড়ে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্তের স্রোত যেন। আদিবাসীদের মনের হিংস্রতা প্রতিফলিত হয়েছে তার মধ্যে। ডাইনীকে পুড়িয়ে মারবে ব'লে একটা গোটা বনকে পুড়িয়ে ফেলছে তারা।

ওরা আছে এই আগুনকে ঘিরে। ওদের চোখের সামনে দেখতে না পাই, আগুনে তেতে ওঠা বাতাসের মধ্যে ওদের মনের হিংস্রতার স্পর্শ পাই।

পূর্ণেন্দু বললেন, কথা ছিল ফাদার ফ্রান্সিস-এর সঙ্গে নৈশভোজ সারব। কিন্তু তা তো আর সম্ভব নয়, কাজেই হিমানীর টিফিন কেরিয়ারে যা আছে তাই ভাগ ক'রে খাওয়া যাক।

খাওয়ার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি আমাদের কারুরই ছিল না, কিন্তু পূর্ণেন্দু নাছোড়বান্দা—প্রায় জোর-জবরদস্তি ক'রে খাওয়ালেন তিনি আমাদের। বললেন, খালি পেটে কোন কাজ করা যায় না—জানেন নিশ্চয়ই হাংরি আর্মি ক্যান নট মার্চ···

—কিন্তু আমরা তো কিছুই করতে পারছি না···এখান থেকে এক পা নড়বারও ক্ষমতা নেই আমাদের···

আমার কণ্ঠস্বরে ব্যক্ত কাতরতা স্পর্শও করে না পূর্ণেন্দুকে। মৃদু হেসে তিনি বললেন, এখন করতে না পারি, সময়মত করব···

—না, না। জোহান গম্ভীর মুখে বললে, ওরা আপনাদের দিকেও নজর রাখছে—আপনারা কিছু করার চেষ্টা করলেই ওরা আপনাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

—এ তুমি জানলে কী ক'রে জোহান? জোহানের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকালাম আমি: তুমি তো আগাগোড়াই আছ আমাদের সঙ্গে, ওরা কী করবে না করবে তা তো তোমার জানার কথা নয়!

—জানার কথা নয়, তবু জানি। মানে, বুঝতে পারি। ওদের মনের ভাব এখানকার বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে কিনা…

পূর্ণেন্দুর পাশে ঘন হয়ে ব'সে হিমানী বললেন, আমার ভীষণ ভয় করছে গো।

—ভয় কিসের? হিমানীর কাঁধে হাত রাখলেন পূর্ণেন্দু।

১৩

হঠাৎ দ্বিগুণ বর্ধিত হল আগুনের শিখা। আগুনে যেন ইন্ধন জোগাতে শুরু করেছে কেউ। বনের মধ্যে যেখানে যা কিছু জীর্ণ বা শুকনো ছিল, সব এনে যেন ঐ আগুনের মধ্যে জড়ো করা হচ্ছে। আগুনের উগ্রতার সঙ্গে তাল রেখে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে আদিবাসীরা—তারস্বরে চিৎকার করতে শুরু করেছে তারা।

হঠাৎ আগুনের মধ্যে আবর্ত জাগে। আগুন নিয়ে লোফালুফি করছে যেন কারা। আগুন নিয়ে যেন সর্বনেশে এক খেলায় মেতে উঠেছে।

ভ্যালেনটাইন বল্-এর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে অনেক জায়গায় আছে বনের আগুনের কথা। এদেশের সব বনেই আগুন দেখেছেন তিনি। বর্ষা ও শরৎ ছাড়া সব ঋতুতেই বহ্নিমান থাকত বনগুলি। আর্য মুনি-ঋষিদের যজ্ঞের আগুনের মতই নিভত না বনের আগুন। "আগুন আমার ভাই, তোমারই জয় গাই"—এই কথাটি যেন সতত সোচ্চার হয়ে থাকত অনির্বাণ বহ্নিবন্যায়।

কেন এই আগুন? এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে বল্-সাহেব দেখলেন, এ দেশের অসহায় বনবাসীদের একমাত্র সহায় আগুন। হিংস্র বন্য প্রাণী ও দুরন্ত শীতের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য অপরিহার্য ছিল আগুন। আগুন নিভে যাওয়া মানেই তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া। তা ছাড়া, আগুন জ্বালাবার কৌশলও জানা ছিল না সকলের। প্রতিটি দল বা গোষ্ঠীর মাত্র দু-একজন চকমকি পাথরের সাহায্যে আগুন জ্বালাতে পারত। কাজেই যে আগুন তারা জ্বেলে দিয়ে যেত, তাকে নিভতে দিতে ভরসা পেত না বাকি সকলে। অতএব বনের গাছপালা পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়ে আগুন সংরক্ষণ করা হত।

কদাচিৎ কখনো সখনো বনের আগুনের মধ্যে আদিবাসীদের মনের হিংস্রতা প্রতিফলিত হত। আগুন জ্বালাত তারা বিরোধী গোষ্ঠী বা শত্রুপক্ষের বনের সীমানায়, তাদের বাঁশ বা কাশের ঝুপড়িতে।

তা ছাড়া, ডাইনীদের পুড়িয়ে মারার জন্যও আগুনের প্রয়োজন হত। বনে বনে বাঘ-ভালুক বুনো শুয়োরের মত ডাইনী শিকারেরও তৎপরতা দেখা যেত। সর্বদাই দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াত ব'লে ডাইনীদের কাবু করা হত আগুন লাগিয়ে।

একশো বছর বাদে আজও বনের আগুন অপরিহার্য হয়ে আছে বনের মানুষদের কাছে। সভ্যতা তথা শিল্পোন্নয়নের পথে এ দেশ যতই অগ্রসর হোক, আত্মরক্ষার জন্য আজও বনের বাসিন্দারা বনে আগুন জ্বালিয়ে, আগুনপোড়া মাটিতে জুম চাষ করে। তা ছাড়া, শত্রু সংহার বা ডাইনীদের পুড়িয়ে মারার জন্যও বনে বনে আগুন জ্বলে। চৈত্র বা বৈশাখ মাসে শুকনো পাতা ঘাস ও ডালপালায় আপনা থেকেই যে আগুন জ্বলে, তাকেও স্বাগত জানায় বনের বাসিন্দারা।

কোলাহল বেড়েই যায়। মূল আগুনের বৃত্ত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে আসে অসংখ্য আগুনের বিন্দু। আদিবাসীরা বোধ হয় প্রত্যেকে মশাল জ্বালিয়ে নিয়েছে এবং চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

মাত্র দুজনের বিরুদ্ধে পাঁচশো জনের এই যৌথ তৎপরতাকে ধিক্কার কেউ-ই দেবে না, কারণ ওদের লড়াই একজন ডাইনীর বিরুদ্ধে। ডাইনীর মৃত্যু সকলেই চায়, সকলে মিলে তাকে পুড়িয়ে মারাকে কাপুরুষোচিত ব'লে ধিক্কার দেবার মত সৎসাহস কারুরই নেই। আমার মনে হল, এ ব্যাপারে যথোচিত মন্তব্য করতে পূর্ণেন্দুও যেন সাহস পাচ্ছেন না।

থাকতে না পেরে আমি শেষ পর্যন্ত ব'লে উঠলাম, মাত্র দুজনের

বিরুদ্ধে পাঁচশো জন—এর চেয়ে ধিক্কারজনক আর কী হতে পারে!

—পৃথিবীর সর্বত্রই এ ধরনের ধিক্কারজনক ব্যাপার ঘটছে এবং ঘটবে। পূর্ণেন্দু বললেন, কিন্তু এক্ষেত্রে দুজনের বিরুদ্ধে পাঁচশো জন এ কথা বলা ঠিক হবে না, কারণ দুজনের সঙ্গে আছে দুটো হাতি···

ইতিমধ্যে কোলাহল আরও বাড়ে। পাঁচশো জনের সম্মিলিত চিৎকার যেন আর্তনাদের রূপ নেয়! সঙ্গে সঙ্গে আগুনের বৃত্তকে ঘিরে প্রচণ্ড তোলপাড় জাগে।

—ওরা পালাচ্ছে! উত্তেজিত স্বরে ব'লে উঠলেন পূর্ণেন্দু।

মিনিট দশেকের মধ্যে আট-দশ জন ওঁরাও যুবক ছুটতে ছুটতে এল আমাদের কাছে, হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, আমাদের বাঁচান—হাতি তাড়া করেছে।

—এদিকেই আসছে বুঝি? রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলেন পূর্ণেন্দু।

—তা জানি না।

—এল না অবশ্য এদিকে, ঠিক কোন্ দিকে তারা গেল তাও বোঝা গেল না।

১৪

পূর্ণেন্দু বললেন, কোন্ দিকে গেছে বোঝা না গেলেও চিন্তার কোন কারণ নেই। কারণ বনরাজ ও ঝিমলী ওদের রক্ষা করবে। আর খোঁজাখুঁজি ক'রে লাভ নেই, চলুন ফিরে যাই ··

হিমানী ও পূর্ণেন্দু ফিরে গেলেন যশপুর নগরে এবং আমি ফিরে এলাম আসানবনী।

আসানবনীতে ফেরার পর পেলাম ডিরেক্টর জেনারেলের চিঠি। তিনি লিখেছেন, আরও ভাল ক'রে খোঁজ—যে ক'রে হোক ওদের খুঁজে বের করতেই হবে।

আবার নতুন ক'রে শুরু করি আমার সন্ধান-পর্ব।

সিংভূম-রাঁচি-সুরগুজার বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে ব্যাপক অনুসন্ধানের পর বুঝতে পারি যে, বন্য প্রাণীদের মতই আত্মরক্ষার জন্য আত্মগোপন ক'রে আছে শুভ্রজ্যোতি। আদিবাসীদের হাত থেকে বাঁচতে হ'লে লুকিয়ে থাকাই নিরাপদ তার পক্ষে। কলকাতায় গিয়ে আমাদের ডিরেক্টর জেনারেলকে একথা বলতে তিনি বললেন, শুভ্রজ্যোতি সারাজীবন বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকবে তা তো আর হয় না। তা ছাড়া, বনের পশুদের যেমন তাদের গোপন আস্তানা থেকে খুঁজে খুঁজে বের ক'রে শিকার করা হয়, ওকেও তেমনি ওর গুপ্ত আশ্রয় থেকে টেনে বের ক'রে হয়তো খুন করবে ওরা। বনের অন্ধি-সন্ধি সবই তো ওদের জানা। কাজেই যে ক'রে হোক ওকে উদ্ধার করো। দরকার বুঝলে পুলিশের সাহায্য নাও।

কিন্তু পুলিশের সাহায্য নিতে গিয়ে দেখি যে, পুলিশ এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে নারাজ। সুরগুজার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আমাকে বললেন, আদিবাসীদের শাস্তির হাত থেকে শুভ্রজ্যোতিবাবুকে

রক্ষা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় মিস্টার রায়। গাঁ-বুড়োরা যদি তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে থাকে, আদিবাসীরা তা কার্যকর করবেই—তাকে ঠেকাবার সাধ্য আমাদের নেই। জঙ্গলে ওদের আইনই আইন, আমাদের আইন-কানুন খাটে না।

—তাহ'লে এখানে আছেন কেন আপনারা? ঈষৎ উষ্মা প্রকাশ ক'রে বললাম আমি।

—চাকরি বজায় রাখার জন্য আছি। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, এখানে থাকা না-থাকা যদি আমাদের ইচ্ছার ওপরে নির্ভর করত, এক মুহূর্তও থাকতাম না।

—শুভ্রজ্যোতিকে বাঁচাবার কি কোন উপায়ই নেই? কোন-ক্রমেই কি ওকে ওদের খপ্পর থেকে উদ্ধার করা যাবে না? কাতর কণ্ঠে আমি প্রশ্ন করি।

—না। পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন, আপনি যদি সে চেষ্টা করেন আপনি নিজেও ওদের খপ্পরে পড়ে যাবেন। কালনাগিনীর মতই ওদের আক্রোশ, তা থেকে বাঁচবার কোন উপায়ই নেই।

—কালনাগিনীর আক্রোশ কথাটা কিন্তু আপত্তিজনক। মৃদু হেসে বললাম আমি, এ-হেন মন্তব্য কালনাগিনী বা কালনাগ কারুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, কারণ সাপেরা কারুর ওপরে আক্রোশ পুষে রাখে না।

—আপনি কি আমার চেয়ে বেশী জানেন? আমার মুখের ওপরে তীব্র দৃষ্টি হেনে বললেন এস. পি.। আমার সমস্ত কর্মজীবন বনে-জঙ্গলে কেটেছে—সাপেদের স্বভাব সম্বন্ধে আপনার চেয়ে আমি অনেক বেশি জানি।

—আমার কর্মজীবনও বনে বনেই কাটছে মিস্টার এস. পি.। সাপেদের সঙ্গে আমারও সাক্ষাৎকার হয়েছে···

—সাপেদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হ'লেও সাপুড়েদের সঙ্গে নিশ্চয়ই

হয়নি। এই সব বুনো জায়গায় ক্রিমিন্যালদের পিছু নিতে গিয়ে অন্ততঃ দুশো সাপুড়ের সংস্পর্শে এসেছি আমি। তাদের কাছ থেকে জেনেছি সাপই হচ্ছে পৃথিবীর হিংস্রতম প্রাণী। আক্রোশ পুষে রেখে শোধ নেওয়ার প্রবৃত্তি সাপ ছাড়া আর কারুর নেই।

— আমার অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্য রকম মিস্টার এস. পি.।

—কী রকম শুনি?

—শুনবেন! শোনবার সময় আছে আপনার?

—আছে বইকি। এই বুনো জায়গায় আর কিছু না থাক সময় যথেষ্ট আছে—এখানকার সবচেয়ে বড় সমস্যা হল প্রয়োজনের অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত সময় কাটানো। বলুন, কী বলতে চান।

ইতিমধ্যে কফি ও পকৌড়া দিয়ে যায় এস. পি. সাহেবের আর্দালি। কফির কাপে চুমুক দিয়ে আমি এস. পি. সাহেবকে বুঝিয়ে দিই যে, কালনাগিনীর আক্রোশ কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়। বনে-জঙ্গলে আমার আটাশ বছরের পর্যটন বন্য পশুদের হিংস্রতা দিয়ে বিঘ্নিত হ'লেও কালনাগিনীর আক্রোশ দিয়ে কখনো বিপর্যস্ত হয়নি।

প্রকৃতির মুক্তাঙ্গনে ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে আমি অনেকবার সাপের কাছাকাছি হয়েছি, নির্বিষ থেকে শুরু ক'রে বিষধর সব রকম সাপের সঙ্গে সহাবস্থানে বাধ্য হয়েছি। সাপের কাছাকাছি থাকা বা তাকে কাছের থেকে দেখার যে দুর্লভ সুযোগ আমার হয়েছে, তা থেকে বুঝেছি যে যত বিষাক্তই হোক, তার স্বভাবের মধ্যে হিংস্রতা নেই। আত্মরক্ষার জন্য দংশন করলেও তেড়ে এসে ছোবল মারতে সাপের রাজা শঙ্খচূড়কেও দেখা যায় না। ব্যক্তিবিশেষের ওপরে আক্রোশ পুষে রেখে তার ওপরে প্রতিহিংসার প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করা সাপের স্বভাব-বিরুদ্ধ, কারণ শত্রুকে চিনে রাখার ক্ষমতা তার নেই। কারুর হাতে কোন সাপ আহত হ'লে, তার ওপরে শোধ নেবার কোন চেষ্টা সে করতে পারে না, কারণ সাপের চোখের দৃষ্টি বা স্মৃতিশক্তি কোনটাই প্রখর নয়।

এই প্রসঙ্গে এক জোড়া কেউটে সাপের কথা বললাম এস. পি. সাহেবকে। আমি তখন বিহারে ঝাঝার কাছে একটি গ্রামে ক্যাম্প ক'রে আছি। একটি আমবাগানের মধ্যে খাটিয়েছি আমার সুইস কটেজ তাঁবু। একদিন রাত্রে তাঁবুর মধ্যে আলো জ্বালিয়ে চেয়ারে ব'সে বই পড়ছি, এমন সময় এক জোড়া কালো কেউটে ঢুকল সেখানে। একেবারে আমার সামনে এসে হাজির হল। আমাকে আক্রমণ করার কোন মতলব হয়তো ছিল না ওদের, হয়তো ভাল ক'রে লক্ষ্যও করেনি আমাকে, তবুও ভয় পেয়ে চিৎকার ক'রে উঠেছিলাম আমি। আমার চিৎকার সাপ দুটির কানে যায়নি, কারণ সাপের কোন শ্রবণশক্তি নেই। আমার চিৎকার নয়, টেবিলে রাখা কেরোসিনের আলোয় আকৃষ্ট হয়ে সাপ দুটি ফণা তোলে এবং আলোর দিকে চেয়ে অল্প অল্প দুলতে থাকে। ইতিমধ্যে আমার চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে লাঠি হাতে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ে আমার চাকর বীর বাহাদুর। সাপ মারায় তার অসাধারণ দক্ষতা—একসঙ্গে দুটি কেউটেকেই মারবে ব'লে লাঠি উঁচিয়েছিল সে। কিন্তু মারা পড়ল একটি, অন্যটির ওপরে আঘাত হানবার আগেই সে পালিয়ে গেল। পলাতক সাপটির পিছু নেওয়া সম্ভব ছিল না, কারণ নিমেষের মধ্যেই যেন সে অদৃশ্য হয়ে গেল। মরা সাপ নাকি মৃত অবস্থাতেই দংশন করতে পারে, কাজেই তাকে বাইরে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলল বাহাদুর।

সাপ দুটির মধ্যে মারা পড়েছে পুরুষ সাপটি। বীর বাহাদুরের ধারণা, সঙ্গীর হত্যার শোধ নেবার জন্য ফিরে আসবে সাপিনীটা। তার জন্য সে আমাকে সজাগ এবং সতর্ক থাকতে উপদেশ দিল এবং নিজেও হাজির রইল তাঁবুর সামনের চিক দিয়ে ঘেরা বারান্দায়। সাপটির প্রতীক্ষায় রাত প্রায় একটা পর্যন্ত সজাগ থাকার পর যখন ঘুমিয়ে পড়লাম, তখন এল সাপটি। পুরোপুরি নিঃশব্দে এলেও তার উপস্থিতি আমার অবচেতন মনে এমনি একটা অস্বস্তি সঞ্চার করে যে আমার ঘুম ভেঙে যায়। চোখ মেলেই তাকে দেখতে পাই। তার সঙ্গীকে যেখানে মারা হয়েছে সেখানে ঘুরতে থাকে নিঃশব্দে। হয়তো তার

সঙ্গীর গায়ের গন্ধ লেগে আছে ওখানে—ঐ গন্ধই ওকে টেনে নিয়ে এসেছে। তার সামনেই হত্যা করা হ'লেও তার সঙ্গীর মৃত্যু যেন তার বুদ্ধির অতীত—তাই খুঁজে বেড়াচ্ছে সে তাকে।

বেশ কিছুক্ষণ ব্যর্থ খোঁজাখুঁজির পর সাপটি বেরিয়ে গেল তাঁবু থেকে। কালো রঙের কেউটে—খাঁটি কালনাগিনী বলা চলে—কিন্তু তার মধ্যে আক্রোশের ছিটেফোঁটাও দেখিনি সেদিন। সেদিনই শুধু নয়, আরও অনেকদিনই বিষাক্ততম সাপেরও স্বভাবে নির্ভেজাল অহিংসা ছাড়া আর কিছু দেখিনি। সাপের ওপরে অকারণে হিংস্রতা আরোপের মধ্যে হয়তো মানুষের স্বভাবের হিংস্রতাই প্রতিফলিত হয়।

—এখন বুঝতে পারছেন তো মিস্টার এস. পি.! কেউটে প্রসঙ্গে আমার কথা শেষ ক'রে বললাম, আপনার কথাটাকে নিছক উপমা বলেই ধ'রে নিতে হয়। আদিবাসীরা তাদের মনের মধ্যে আক্রোশ পুষে রাখে নিজেদের স্বভাবের প্রেরণায়, তাদের এই স্বভাবের হিংস্রতাকে সাপের সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয়। মানুষের মনের "গোপন হিংসাকে" সাপের স্বভাবের সঙ্গে তুলনা করা সর্বৈব ভুল, কারণ সাপ গোপনচারী হলেও গোপন হিংস্রতা তার স্বভাবে নেই।

আমার কথার ওপরে কোন কথা বলেন না এস. পি সাহেব। কিন্তু সাপ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা বা ধারণাকে মেনে নিতে পারে না আমার ড্রাইভার জোহান মুণ্ডা। আমার সব কথা শুনে সে গম্ভীর মুখে বললে, পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কথার মধ্যে কোন ভুল নেই স্যার—কালনাগিনীর আক্রোশ যে কী সাংঘাতিক জিনিস তা আমরা—মানে বনের মানুষরাই জানি। যার ওপর তার আক্রোশ, দুনিয়ার শেষ সীমা পর্যন্ত তার পেছনে পেছনে ধেয়ে যাবে সে—তাকে না মারা পযন্ত তার শান্তি নেই। কালনাগিনী নিয়ে অবশ্য এখন মাথা না ঘামালেও চলবে, কালনাগিনীর মত যাদের আক্রোশ তাদের কথাই বরং ভাবা যাক। মুণ্ডা মেয়ে মানকীকে নিয়ে পালিয়েছে ব'লে শুভ্রজ্যোতিবাবুর ওপরে ওদের আক্রোশ কালনাগিনীর আক্রোশকেও

ছাপিয়ে গিয়েছে, আপনি ওঁকে এখান থেকে উদ্ধার ক'রে শহর কলকাতাতেও যদি যান, সেখানেও পৌঁছে যাবে ওরা।

—তা যদি হয় কলকাতা শহরে গিয়েও থামব না। আমি বললাম, বিদেশে পাঠিয়ে দেব ওদের—ধর লণ্ডন···নিউ-ইয়র্ক।

—লণ্ডন নিউ-ইয়র্ক কেন, ভিন্ গ্রহে পাঠিয়ে দিন না—সেখানেও পৌঁছে যাবে ওরা।

জোহানের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে আমি বললাম, তুমি কোন্ দলে জোহান?

—আপনার দলে স্যার। মৃদু হেসে জবাব দিল জোহান, আপনার সঙ্গে আছি—আপনি যা বলবেন তাই করব।

—কিন্তু তোমার কথা বলার ভঙ্গীতে মনে হচ্ছে এখানকার আদিবাসীদের আক্রোশ তোমাকে স্পর্শ করেছে—ওদের মত তুমিও জ্যোতিকে শাস্তি দিতে চাইছ।

—না স্যার, না। চাপা অথচ দৃঢ় স্বরে জোহান বললে, আমি আপনার মত ওকে বাঁচাতেই চাইছি। বাঁচাতে চাইছি ব'লেই বলছি ওকে উদ্ধার করার চেষ্টা করবেন না—ওকে বনের মধ্যে আত্মগোপন ক'রে আত্মরক্ষা করার সুযোগ দিন।

—কিন্তু সে কি সম্ভব জোহান? জোহানের মুখের দিকে আমি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালাম। আদিবাসীরা বনের মানুষ, তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে কি সে পারবে?

—পারবে। যদি এমন একটি জায়গা বেছে নিতে পারে যেখানে যেতে আদিবাসীরাও ভয় পায়।

—তেমন কোন জায়গা কি এখানে আছে জোহান?

—বলতে পারব না স্যার—আমি তো এখানকার লোক নই। তবে রাঁচিতে একজন জড়িবুটিওয়ালা বুড়োর কাছে শুনেছিলাম, সোনাহাট-ঝিলিমিলির উত্তর দিকে এমন জায়গা আছে যেখানে যেতে এখানকার আদিবাসীরা ভয় পায়। আপনার কাছে যে বইটা আছে, তাতে হয়তো সে জায়গার উল্লেখ আছে।

ঠিকই আন্দাজ করেছে জোহান। বল্‌-সাহেবের বইতে উত্‌দা ও পাটপুরিয়ার মালভূমি জোড়া বিস্তীর্ণ জনমানবশূন্য অঞ্চলের উল্লেখ আছে। স্থানীয় আদিবাসীরাও ওখানে যেতে ভয় পেত বলে বল্‌-সাহেবকেও নিষেধ করেছিল ওখানে যেতে। বল্‌-সাহেব অবশ্য মানেননি তাদের নিষেধ—একটানা দু'মাস ধ'রে ঘোরাঘুরি করেছিলেন ওখানকার দুর্গমতার মধ্যে।

দুর্গম ও দুর্ভেদ্য বনের মধ্যে রকমারি বন্য প্রাণীর সমাবেশ ভয়ঙ্কর ব'লেও মনে হয়নি বল্‌-সাহেবের কাছে। বন্যদের বনের মধ্যে সুন্দর ব'লেই মনে হয়েছিল তাঁর। আদিবাসীরা ওখানে শিকার করতে যেত না বলে বনের পশুদের মানুষ সম্বন্ধে কোন ভয় ছিল না, বল্‌-সাহেব বা তাঁর অনুচরদের দেখে তারা পালিয়ে যাবার কোন চেষ্টাই করেনি। তাঁর রাইফেল বা বন্দুকের সহজ নাগালের মধ্যে এমনি সহজেই তারা ধরা দিয়েছিল যে, শিকারের স্পৃহা ঘুচে গিয়েছিল তাঁর। অস্ত্র বর্জন করে দুধী নালার ধারে ব'সে তাদের আনাগোনা দেখতেন তিনি মুগ্ধ বিস্ময়ে।

বন বা বনের পশু কোন কিছুরই মধ্যে ভয়ঙ্করের কোন চিহ্ন না দেখে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন বল্‌-সাহেব। তিনি বুঝতে পারেননি এ 'অভয়-অরণ্যে' স্থানীয় আদিবাসীরা কিসের ভয়ে ভীত। বিস্তর চিন্তার পরও যখন এ রহস্যের কোন সমাধান করতে পারলেন না, তখন তাঁর মনে হল বুঝি এদের ভয়ের কোন অতি-প্রাকৃত কারণ আছে। প্রকৃতি এখানে নিত্য-প্রসন্না, গাছপালা, ফুলফল ও লতা-ঝোপের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকীর্ণ হয়ে উঠছে প্রাকৃতিক দাক্ষিণ্য—প্রকৃতির প্রসন্ন বরাভয় রূপ বন্য পশুদের অহিংস সহাবস্থানের মধ্যেও প্রতিফলিত। কাজেই ভয় এখানে হয় অকারণ মনোবিকার, নয়তো বুদ্ধির অতীত কোন কুসংস্কার।

যা বুদ্ধির অতীত তা নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না বল্‌-সাহেব, কাজেই নিশ্চিন্তমনে চালিয়ে যান তিনি তাঁর কাজ। মাটির আবরণের

নিচে পাথরের স্তর পরীক্ষা ক'রে তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন খনিজের খোঁজ ক'রে যান।

এখানকার কাজ শেষ ক'রে এখান থেকে চলে যাবার আয়োজন করছেন বল্-সাহেব, এমন সময় ঘটল একটি অদ্ভুত ঘটনা। এই ঘটনাটির মধ্য দিয়েই বল্-সাহেব পেয়ে গেলেন তাঁর প্রশ্নের উত্তর।

সেদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ আকাশে মেঘ ক'রে বৃষ্টি নামল। বৃষ্টি চলল মুষলধারে একটানা মাঝরাত্রি পর্যন্ত। তারপর বৃষ্টি থামল—মেঘ কেটে গিয়ে তারা ফুটে উঠল আকাশে। মুছে গেল দুর্যোগের সব চিহ্ন, তারাভরা আকাশের প্রান্তে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল কৃষ্ণপক্ষের এক ফালি চাঁদের হাসি। এমন সময় শুরু হল আর একটি দুর্যোগ। চোখে দেখা যাচ্ছে না, মাটির স্তরকে কাঁপিয়ে ধ্বনিত হয়ে ওঠে একটা প্রচণ্ড গর্জন। যেন একটা অদৃশ্য দানব মাটির তলায় দাপাদাপি ক'রে বেড়াচ্ছে।

প্রথমে তাঁর মনে হল বুঝি ভূমিকম্প শুরু হয়েছে, কিন্তু তাঁবু থেকে বেরিয়ে খানিকক্ষণ পায়চারি করার পর বুঝলেন ভূমিকম্প নয়—মাটির তলায় অন্য কোন একটা দুর্যোগ ঘটে চলেছে। কিন্তু এবার ভূমিকম্প ছাড়া মাটির নিচে আর কী দুর্যোগ ঘটতে পারে বুঝতে পারেন না। ইতিমধ্যে তাঁর অনুচরেরা বেরিয়ে আসে তাদের তাঁবু থেকে—ভয়ে ঠকঠক ক'রে কাঁপতে কাঁপতে বলে, পাতালপুরীর দৈত্য হুজুর! মাটির নিচে দাপাদাপি ক'রে বেড়াচ্ছে।

মাটির নিচে দাপাদাপি ক'রে বেড়ানো পাতালপুরীর দৈত্য আজগুবি কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়, কিন্তু এই আজগুবিকেই মেনে নিতে বাধ্য হন বল্-সাহেব বুদ্ধিগ্রাহ্য অন্য কোন ব্যাখ্যা না পেয়ে। অনুচরদের ভয় তাঁর মধ্যেও সংক্রামিত হয়। আদিবাসীদের ভয়ের কারণটাও এবার বুঝতে পারেন তিনি—কেন যে তারা এখানে আসতে চায় না, তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তাঁর কাছে। ব্যাপারটা পরীক্ষা ক'রে তার রহস্যভেদের ইচ্ছে থাকলেও অনুচরদের ভয়ের তাড়নায় তা পেরে ওঠেন না। ভয় অবশ্য তাঁর নিজের মনেও দেখা দিয়েছিল। তাঁর ডায়েরির ছত্রে ছত্রে তা ফুটে উঠেছে।

বল্‌-সাহেবের উত্‌দা-পাটপুরিয়া পর্যটনবৃত্তান্ত পড়া শেষ ক'রে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি, জোহান হাসছে আমার মুখের দিকে চেয়ে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে বললে, পেলেন তো জায়গাটার হদিস!

—হ্যাঁ। আমি জবাব দিলাম।

—শুভ্রজ্যোতিবাবুর পক্ষে জায়গাটি খুব নিরাপদ নয় কি? এখানকার আদিবাসীরা প্রাণ থাকতেও যাবে না ওখানে।

—সেইদিক থেকে নিরাপদ হ'লেও জায়গাটি কি সত্যিই নিরাপদ? বল্‌-সাহেব মাটির তলার দানবের কথা লিখেছেন।

—লিখেছেন বুঝি? উৎসুক কণ্ঠে ব'লে উঠল জোহান, সাহেব নিজের চোখে দেখেছিলেন?

—না। তবে চোখে না দেখলেও তার তর্জন গর্জন শুনতে পেয়েছিলেন। আচ্ছা জোহান, তুমি কি কিছু জানো এই দানবটা সম্বন্ধে?

—না, না—আমি কিছুই জানি না! জোহান ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললে, রাঁচির ঐ জড়িবুটিওয়ালা বুড়োর কাছ থেকে যেটকু জেনেছি, তার থেকে আমার এই ধারণা হয়েছে যে সোনাহাট-ঝিলিমিলির উত্তরের ঐ পাহাড় একটা ভয়ানক জায়গা, এখানকার আদি-বাসীরা ওখানে কখনোই যায়নি, যাবেও না। দৈত্য-দানব সম্বন্ধে কিছুই জানি না আমি, জানতে চাইও না।

—জানতে তুমি না চাইতে পার, আমার জানা দরকার। আমি গম্ভীর মুখে বললাম, এখানকার কোন গাঁ-বুড়োর কাছ থেকে জেনে এসে বল আমাকে।

—না হুজুর, জোহান কাতর স্বরে বললে, কেউ-ই ওখানকার কোন কথা মুখেও উচ্চারণ করবে না। জানলেও কিছু বলবে না।

—ঠিক আছে, আমি নিজেই যাব ওখানে।

—না না! জোহান শিউরে উঠে বললে, আপনি কেন যাবেন ওখানে—আপনাকে তো তাড়া করেনি ওরা!

—শুভ্রজ্যোতিকে খুঁজে বের করার জন্যই যাব। তুমি বোধ হয় ঠিকই বলেছ জোহান, তাড়া খাওয়া জন্তুর মতই শুভ্রজ্যোতি হয়তো ওখানে গিয়েই আশ্রয় নিয়েছে। তাছাড়া, বল্-সাহেবের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রেও তার ওখানে পৌঁছে যাবারই কথা।

নিমেষে ছাইয়ের মত সাদা হয়ে ওঠে জোহানের মুখ। খানিকক্ষণ নিঃশব্দে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সে বললে, দোহাই হুজুর, ওখানে যাবেন না!

—আমাকে যেতেই হবে জোহান। দৃঢ়স্বরে বললাম আমি, শুভ্রজ্যোতিকে খুঁজে বের করতেই হবে আমাকে। তোমার যদি ভয় করে, তুমি নাহয় না গেলে আমার সঙ্গে।

—আপনি একা যাবেন! জোহানের চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

—উপায় কী বলো! ম্লান হেসে বললাম আমি, তুমি বা আর কেউ যদি আমার সঙ্গে না যায়, আমাকে একলাই যেতে হবে।

১৫

একাই চললাম আমি জীপ নিয়ে। জোহান রইল গর্চার ডাক-বাংলোয়, আমি আমার জিনিসপত্র একটি খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে এগিয়ে চললাম উত্তুদা-পাটপুরিয়া পাহাড়ের উদ্দেশে।

ঘন বনের মধ্য দিয়ে পায়ে-চলা পথ। পথটি বনের কাঠুরিয়াদের পায়ে-পায়ে তৈরি হয়েছে। লোকজনের কোন বসতি চোখে পড়ছে না, শুধু শাল-পলাশ-আসান-পাড়াশী গাছের বন। বড়ো বড়ো গাছের মাঝখানকার শূন্যস্থানকে পূর্ণ করেছে কুরচি ও চিহোড় লতার ঘন ঝোপ। সরু পথটি ঘন বনকে বিশ্লিষ্ট ক'রে কোন দিকে যাচ্ছে বোঝার উপায় নেই। তথাপি এই পথ ধ'রেই অনিবার্যভাবে চলতে হচ্ছে, কারণ এ ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই।

বনের মধ্যে মাইল তিন চার হাঁটার পর ক্রমে উঁচু হয়ে উঠতে থাকে পথটা—তারপর হঠাৎ শেষ হয়ে যায়। পথের এই হঠাৎ শেষ হয়ে যাওয়াটা আচমকা যেন ধাক্কা মারে আমাকে। চমকে উঠে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি, বন যেন হঠাৎ উত্তুঙ্গ হয়ে উঠে পাহাড়ের আকার নিয়েছে। পাহাড়ের ওপরে বনের আবরণ যেন সবুজ ঢেউয়ের মত ওপরের দিকে উঠে গিয়েছে।

এই হল উত্তুদা-পাটপুরিয়া পাহাড়! নিষিদ্ধ পাহাড় যেন অভ্রভেদী নিষেধের আকারেইআকাশ ছুঁয়েছে। দুর্গম এবং দুরারোহ। আরোহণের চেষ্টা করতে গিয়েও ব্যর্থ হই পাহাড়ের গায়ে পথের আভাস না পেয়ে। পথের কোন চিহ্ন না দেখেও পথ চলার ঝোঁক চাপল আমার। কবি বলেছেন, "পায়ে পায়ে পথ তৈরি হয়"। এখানে বন্য প্রাণীদের পায়ে-পায়ে চলা পথের দুঃখ সইবার ক্ষমতা মানুষের নেই, সুস্পষ্ট চিহ্ন ছাড়া সে চলতেই পারে না। কিন্তু বনের পশুদের পথ চলার জন্য সুস্পষ্ট

কোন পথের প্রয়োজন নেই। চলার আবেগেই চলে সে ঝর্ণার ধারার মত—পথহীন পথে তার যাত্রা কোন সীমা মানে না। অতএব সামনের ঐ দুরন্ত চড়াই ডিঙিয়ে যেতে হ'লে আমাকে বনের পশুদের পায়ে-পায়ে যেতে হবে।

কিন্তু গ্রীষ্মের এই প্রখর রৌদ্রদগ্ধ মধ্যাহ্নে পশু-পাখি দূরের কথা, কীট-পতঙ্গদেরও সাক্ষাৎ পাইনে। তাদের বিশ্রামের সময় এখন। ঘন সন্নিবদ্ধ গাছ বা লতাঝোপের ছায়া অথবা কোন ঝর্ণা বা পাহাড়ী নালার ধারে কোথায় তারা বিশ্রাম করছে কে জানে! বনের পশুদের বিশ্রামের জায়গা খুঁজে বের করা খনিজ খোঁজার চেয়েও কঠিন কাজ—খুব দক্ষ ভূবিজ্ঞানীও তা পেরে ওঠেন না। ভ্যালেন্‌টাইন বল নিজেও তো পারেননি, যদিও খনিজের মত বনের মধ্যে বন্য প্রাণীদেরও সন্ধান নিয়েছেন।

হঠাৎ আমার খচ্চরটার কথা মনে এল। বনের পশুদের পায়ে-চলা পথ হয়তো সে পারবে খুঁজে বের করতে। কিন্তু তাকে নিয়ে পাহাড়ের দিকে যেতেই দেখি যে, সে আমারই মত দিশেহারা বোধ করছে—বনের পশুদের পায়ে-চলা পথ চেনার ক্ষমতা তার নেই। মানুষের কাছে পোষ মেনে তার স্বভাবের বন্যতা হারিয়ে ফেলেছে, বন্য প্রাণীদের পায়ে-চলা পথ শনাক্ত করার সাধ্য তার নেই।

অগত্যা অপেক্ষা করতে হয়। জনমানবশূন্য এমনি ঘন বনের মধ্যে অপেক্ষা করা মানে বনের পশুদের সান্নিধ্যে অবস্থান শুধু নয়, তাদের মর্জির কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। যে কোন মানুষ একে রীতিমত দুঃসাহসিক ব'লে মনে করবে। বড় বড় শিকারীরাও আমার এই নিরস্ত্র অবস্থানকে বিপজ্জনক ব'লে মনে করতেন। তাঁরা কেউ আমাকে দেখতে পেলে নিশ্চয়ই জোর ক'রে তুলে নিতেন এখান থেকে। তার অবশ্য কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ জোহান বলছিল যে, শিকারীরাও এই উডুদা-পাটপুরিয়া পাহাড়কে এড়িয়ে চলে—এই পাহাড়ের আতঙ্ক আর সকলের মত তাদের মনেও প্রভাব বিস্তার করেছে।

এখানে আমার এই একা একা অপেক্ষা করার মধ্যে যতই দুঃসাহসিকতা থাক, আমি নিজে তার মধ্যে দুঃসাহসের ছিটেফোঁটাও দেখতে পাইনে। নিজেকে আমি সাহসী বীরপুরুষ ব'লে কখনোই মনে করিনে। এই যে আমি উত্নদা-পাটপুরিয়া পাহাড়ের নিচে চিহোড় লতার ঝোপের আড়ালে আমলকী গাছের ছায়ায় ব'সে আছি, তার মধ্যে যে বিশেষ কোন সাহসের দরকার, তা আমার মনেও হচ্ছে না। বনের পশুপাখিদের কাছাকাছি ও পাশাপাশি থাকাটাকে আমার নিতান্তই সহজ স্বাভাবিক ব্যাপার ব'লে মনে হচ্ছে। বল্ সাহেবের বর্ণনা অনুযায়ী এখানে বাঘ—চিতাবাঘ—বুনোমোষ—গাওর —ভালুক—হরিণ—অজগর ইত্যাদি রকমারি বন্য প্রাণীর সমাবেশ ঘটেছিল। বল্-সাহেব এখানে আসার পর একশো বছর কেটে গেলেও বন্য প্রাণীদের সমাবেশে কোন ব্যতিক্রম ঘটেছে বলে মনে হয় না, কারণ মাটির তলার দানবের ভয়ে শিকারীরা এখানে ঘেঁষতে সাহস পায়নি এবং এখনও পাচ্ছে না।

বন্য প্রাণীরা নিকটেই আছে—তাদের সান্নিধ্য অনুভব করি। তাদের চোখে দেখতে না পেলেও, ভয় পাই না কিন্তু একটুও। অথচ ভয় পাওয়াটা এতটুকুও অস্বাভাবিক নয়, বন্য প্রাণীদের কাছাকাছি নিরস্ত্র অবস্থায় অবস্থান যে কোনও মানুষের পক্ষেই ভয়াবহ। পরিস্থিতি ভয়াবহ হওয়া সত্ত্বেও আমার ভয় না-পাওয়াটার মধ্যে আমার দুঃসাহস নয়, বন্য প্রাণীদের ওপরে আমার আস্থাই প্রকাশ পাচ্ছে। সহজ সহাবস্থানকেই যেন এই বনের আইন বলে মনে হচ্ছে, বাঘ-ভালুক প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীরাও যেন এ সহাবস্থান নীতিকে সহজেই মেনে চলছে।

বেলা পড়ে আসে। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়তে বড়ো বড়ো গাছগুলি চিহোড় লতাঝোপগুলোর ওপরে লম্বা লম্বা ছায়ার তুলি বুলোতে শুরু করে। রোদের সঙ্গে রোদের দাহও গাছপালার মধ্য দিয়ে পরিস্রুত হয়ে স্নিগ্ধতার আমেজ এনে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমন্ত বন যেন জেগে ওঠে। লতা-ঝোপগুলো নড়ে চড়ে, মর্মরধ্বনি জাগে

শুকনো পাতার স্তূপে। পশুপাখিরা যেন ধীরে ধীরে সজাগ হয়ে ওঠে তাদের দ্বিপ্রাহরিক তন্দ্রার ঘোর থেকে।

অদূরে যেখানে চিহোড় লতা কয়েকটি আসান গাছের ডালপালায় জড়াজড়ি ক'রে নিবিড় ছায়া সৃষ্টি করেছে, সেখান থেকে হঠাৎ এক ঝাঁক বনটিয়া উড়ে যায়। গাছের ছায়ার ধূসর রঙটাই যেন চোখের নিমেষে সবুজে রূপান্তরিত হয়ে আকাশে ওঠে—রোদের ছোঁয়া লেগে উজ্জ্বল সোনা রঙের জৌলুস বিকীর্ণ করে। বনটিয়ার ঝাঁক উড়ে যেতেই লতাঝোপের মধ্যে আলোড়ন জাগে—তার নিবিড় ঘন ছায়া ভেদ ক'রে আত্মপ্রকাশ করে এক পা'ল চিতল হরিণ। গাছপালার বুক ফুঁড়ে উজ্জ্বল রক্তাভ বাদামী রঙের একটা স্রোত বয়ে যায়। গাঢ় লালচে বাদামী রঙের চামড়ার জমিনের ওপর অজস্র শুভ্র বিন্দুর সমারোহ—যেন কোন দক্ষ শিল্পীর হাতের চিত্রকলা!

সামনের উত্তুঙ্গ চড়াই বেয়ে উঠতে শুরু করে তারা। বোধ হয়, সারা দিনমান পাহাড়ের নিচে চ'রে বেড়াবার পর চড়াই বেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের আস্তানার দিকে।

পাহাড়ের ওপরে উঠছে তারা, পাহাড়ের ওপরে মালভূমির মাটির তলার অদৃশ্য দানব সম্পর্কে যেন কোন ভয়ই তাদের নেই। মানুষের ভয় বনের প্রাণীদের মধ্যে সহজে সংক্রামিত হয় না, কারণ মানুষের স্বভাবই হল অকারণে ভয় পাওয়া।

চিতল হরিণদের এই নির্ভয়ে অগ্রসর হওয়া আমাকে এগিয়ে চলার প্রেরণা দেয়। বনের পশুদের পায়ে-পায়ে তৈরি পথহীন পথের ওপর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা, কাজেই ঐ পথই আমার পথ।

দ্রুত এগিয়ে যাই আমার মালবাহী খচ্চরটাকে নিয়ে। পথহীন এই পথকে কোনমতেই পথ বলা চলে না, তবু পথ চলতে অসুবিধে হয় না—কারণ বনের পশুদের স্বভাবই হল দুর্গমতাকে সুগম ক'রে তোলা। ওদের সহজ স্বাচ্ছন্দ্য আমার চলার মধ্যে না থাকলেও আমার চলায় কোন বিঘ্ন ঘটে না। এগিয়ে চলি আমি ওদের অনুসরণ ক'রে।

লতাঝোপের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে অতিকায় আকারের ঘাসের মধ্যে ঢুকে পড়ি—আমাকে ও আমার মালবাহী খচ্চরকে গ্রাস ক'রে ফেলে এই ঘাসবন। চিতল হরিণের পালকে চোখে দেখা যাচ্ছে না, ঘাসের স্পন্দন তাদের এগিয়ে চলার আভাস দেয়।

একসময় সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। চড়াই শেষ হয়ে আসে ক্রমশঃ—পাহাড়ের ওপরে মালভূমির আভাস জাগে। ওপরের গাছপালার ঘন সমাবেশ অস্তগামী সূর্যের রক্তরেখায় রঞ্জিত হয়।

বেলা প'ড়ে আসতেই দ্রুততর হয় হরিণদের গতি। আঁধার ঘনাবার আগেই যেন তাদের গন্তব্যে পৌঁছতে চায় তারা। তাদের চলার সঙ্গে তাল রাখতে আমাকেও আমার গতি বাড়াতে হয়। আমার নিজের কোন নির্দিষ্ট গন্তব্য নেই। বাজেই তাদের গন্তব্যকেই আমার গন্তব্য ক'রে নিয়েছি।

চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় এই চিতল হরিণের পাল। মিনিট কয়েক থেমে থাকার পর আবার শুরু করে চলতে।

তাদের এই হঠাৎ থেমে পড়ার কারণ বুঝতে পারি কিছুটা এগিয়ে গিয়ে। সে এক ভয়াবহ দৃশ্য!

একটা দেবকাঞ্চন গাছের ডালপালা থেকে বেরিয়ে এসে একটা মাঝারি আকারের চিতল হরিণকে জড়িয়ে ধরেছে একটি প্রকাণ্ড অজগর সাপ। তার অতর্কিত আক্রমণের দরুনই ব্যাহত হয়েছিল চিতল হরিণের পালের অগ্রগতি। বলা বাহুল্য, ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যই তার এই আক্রমণ, দলের একটিকে ধরতে পেরেই বাকি সবাইকে ছেড়ে দিয়েছে সে। হরিণের পালও তাদের একজনকে তার গ্রাসে সঁপে দিয়ে নির্বিঘ্ন বাধ করেছে এবং এগিয়ে চলেছে তার পাশ কাটিয়ে।

একজনকে হারিয়ে ফেলে দলের কোন ক্ষতি হয়েছে ব'লে মনে হচ্ছে না। তাদের এগিয়ে চলার ভঙ্গীর মধ্যে কোন দুঃখ বা শোক প্রকাশ পাচ্ছে না। তাদের হাবভাবে বোধ হচ্ছে, যেন এ ধরনের ব্যাপারে তারা অভ্যস্ত। দিন কয়েক অন্তর অন্তর হয়তো এমনি ঘটনাই ঘ'টে থাকে। শুধু কি এই অজগর সাপ? বাঘ, চিতাবাঘ, নেকড়ে, বুনো

কুকুর প্রভৃতি বনের অন্যান্য মাংসাশী প্রাণীদের ক্ষুধাও হয়তো এরাই মেটাচ্ছে। মাংসাশী প্রাণীদের সঙ্গে এই খাদ্য-খাদক সম্পর্ককে তারা স্বাভাবিক ব'লেই মেনে নিয়েছে। আত্মরক্ষার চেষ্টা যে তারা করে না, তা নয়। আত্মরক্ষার জন্য পালিয়ে বেড়ানো এদের স্বভাব। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মরক্ষা করা হয়তো সম্ভবও হয় না, কিন্তু সংখ্যার অনুপাতে ক্ষতির পরিমাণ এতই কম যে, তার জন্য কোন দুঃখ এরা অনুভব করে না।

জীবজগতে ভারসাম্য বজায় রাখার কথা প্রায়ই শোনা যায়। কোন প্রাণীর মাত্রাতিরিক্ত সংখ্যাবৃদ্ধি কখনোই কাম্য নয়। হরিণ, খরগোশ, ইঁদুর প্রভৃতি বহু প্রাণীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য তাদের উদ্দেশ্যে মৃত্যুদণ্ড সোচ্চার হয়েছে জীববিজ্ঞানীদের কণ্ঠে। এই সব প্রাণীদের নিজেদের মধ্যেও সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের তাগিদ দেখা যায়। জন্মনিয়ন্ত্রণের কৌশল তাদের জানা নেই, কাজেই মাঝে মাঝে দল বেঁধে আত্মহত্যার হিড়িক পড়ে এদের মধ্যে।

অজগর সাপটি তখন হরিণটিকে জড়িয়ে ধ'রে কুণ্ডলী পাকাচ্ছে। এমনি প্রবল নিষ্পেষণে কোন প্রাণীই বেঁচে থাকতে পারে না—অজগরটি জড়িয়ে ধরা মাত্রই হয়তো এই হরিণটি মারা পড়েছে। হরিণের পালটি অবশ্য তার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না, এই বীভৎস হত্যালীলা সম্পর্কে তারা নির্বিকার। অজগরটির পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তারা।

তারা এগিয়ে যাচ্ছে—তাদের অনুসরণ না করলে আমি এক-পাও যেতে পারব না, কিন্তু তবু আমি দাঁড়িয়ে পড়ি সম্মোহিতের মত। অজগরের দৃষ্টির সম্মোহনী শক্তি কি আমার ওপরে প্রভাব বিস্তার করেছে? তার চোখের দৃষ্টির আওতার মধ্যে তো আমি নেই, তার গ্রাসে আসা হরিণের বাইরে আর কোন কিছুর দিকেই তার নজর নেই। অতএব তার দৃষ্টির মোহিনী-মায়া নয়। তার বীভৎস অতিকায় আকার এবং হিংস্রতাই যেন আমাকে আকৃষ্ট করে তার দিকে।

সুন্দরের মত ভয়ঙ্করের প্রতিও মানুষের আকর্ষণ দুর্বার। হয়তো

ভয়ঙ্করের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন আছে সৌন্দর্য। কোন এক বন্য প্রাণী-বিশারদ সুন্দর ব'লে প্রশস্তি জ্ঞাপন করেছেন অজগরের উদ্দেশে। অজগরের ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য তাঁকে মোহিত করেছিল।

এখানকার আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, সুরগুজার বনাঞ্চলকে বিপর্যস্ত ক'রে তুলেছে প্রায় দেড়শো ফুট লম্বা এক অজগর।

আদিবাসীদের কল্পনার মধ্যে যতই জীবন্ত হোক, একশো দেড়শো ফুট লম্বা অজগরের অস্তিত্ব পৃথিবীর কোথাও নেই। দক্ষিণ আমেরিকার আনাকোণ্ডা সাপও আকারে এত বড় হয় না। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীর অববাহিকাকে আচ্ছন্ন করা ঘন অরণ্যের মধ্যে আনাকোণ্ডা দেখা যায়নি এ পর্যন্ত। আনাকোণ্ডা শব্দটি এসেছে তামিল "আনাই" ও "কোলরা" শব্দ থেকে। "আনাই"য়ের অর্থ হাতি এবং "কোলরা" শব্দটির অর্থ খাদক—অর্থাৎ হাতিকে গিলে খায় এমন একটি অজগর সাপ। হাতিকে গিলে খেতে পারে বা হত্যা করতে পারে, এমন অজগর পৃথিবীর কোথাও না থাকলেও এই নামকরণ পৃথিবীসুদ্ধ স্বীকৃত হয়েছিল। হাতি তো দূরের কথা, মাঝারি আকারের কোন জন্তুকেও বাগে আনতে পারে না আনাকোণ্ডা। মানুষখেকো ব'লে তার যে বদনাম আছে, তা নিছক বদনাম ছাড়া আর কিছু নয়। রলফ্ ব্লম্‌বার্গ নামে একজন শিকারী আনাকোণ্ডার মানুষ মেরে খাওয়ার দুটো বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু তা নিছক গল্প-কথা ছাড়া আর কিছু নয়।

আনাকোণ্ডার মত বড় আকারের সাপ এদেশের কোন বনেই নেই। আমার চোখের সামনে যে অজগর সাপটি চিতল হরিণের পিষে ফেলা মৃতদেহটাকে গিলে খেতে শুরু করেছে, তাকে বোয়া (Boa) জাতীয় মাঝারি আকারের অজগর বলা চলে। লম্বায় তা প্রায় পঁচিশ ফুট হবে।

আমার উপস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন অজগরটি হরিণের মৃতদেহটি গিলতে শুরু করে। এর চেয়ে বীভৎস আর কিছু হয় না,

তথাপি বন্য পরিবেশের সঙ্গে তা সম্পূর্ণ খাপ খেয়ে যায় এবং তাকে প্রকৃতির এই মুক্তাঙ্গনের একটি স্বাভাবিক ঘটনা ব'লেই মেনে নিই।

খাওয়া শেষ হ'লে অজগরটি অসাড় হয়ে প'ড়ে থাকে। চারপাশের বনের গাছপালার মাঝখানে একটা গাছের গুঁড়ির মত প'ড়ে থাকে সে—একটা শালগাছ যেন মাটিতে উৎপাটিত হয়ে পড়েছে।

আবার চলতে শুরু করি আমি। চলতে গিয়ে দেখি যে আমার মালবাহী খচ্চরটি আমার পাশে নেই, আমার অজান্তে পালিয়ে গিয়েছে সে। হয়তো অজগরের ভয়েই পালিয়েছে। এগিয়ে গিয়েছে হরিণের পালটিও। এই পথহীন বনের মধ্যে দিশেহারা বোধ করি। আমার মালপত্র সঙ্গে নেই, কোন দিকে যাব বুঝতে পারছি না, কাজেই দাঁড়িয়ে পড়ি কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত।

ঘন বনের বেষ্টনীর মধ্যে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর বুঝতে পারি যে, দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভ নেই। বনের এই গোলকধাঁধা থেকে মুক্তি পেতে হ'লে এগিয়ে চলতেই হবে। কিন্তু হরিণরা কোন পথে গিয়েছে তা বোঝার উপায় নেই, যেতে যেতে তাদের চলার সুস্পষ্ট কোন চিহ্ন রাখেনি কোথাও। কাজেই কোন দিকে যাব ভেবে পাই না।

এমন সময় গাছপালা, ফুল, ফল ও শুকনো পাতার স্তূপের গন্ধ নাকে এল। হরিণের পালকে অনুসরণ ক'রে এগিয়ে যাওয়ার সময় এ গন্ধ আমার নাকে এসেছিল। বোধ হয়, ওদেরই গায়ের গন্ধ। পায়ের চিহ্ন না রাখলেও গায়ের গন্ধ রেখে গিয়েছে। যে দিক থেকে গন্ধটা আসছে সেদিকে চলতে শুরু করি। চলতে চলতে দেখা পেয়ে যাই তাদের। ওরা লতাঝোপ দিয়ে ঘেরা একটি ফাঁকা জায়গার মধ্যে দাঁড়িয়েছিল, তাদের কাছাকাছি ছিল আমার মালবাহী খচ্চরটি। তাদের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হল যেন তারা আমার জন্যই অপেক্ষা করছে।

তাদের দেখামাত্র আমার মন খুশিতে ভ'রে ওঠে। ওদের সঙ্গে পথ চলতে চলতে আমি যে ওদের ওপরে নির্ভর করতে শুরু করেছি,

তা যেন বুঝতে পেরেছে ওরা ! আমার জন্য ওদের এই অপেক্ষা করার মধ্য দিয়ে যেন বুঝিয়ে দিতে চায় যে ওরা আমার বন্ধু ।

আমি ওদের কাছাকাছি হওয়ামাত্র চলতে শুরু করে ওরা। ততক্ষণে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, গাছপালার মধ্য দিয়ে পরিস্রুত দিগন্তের অস্ফুট আলো ধূসর ছায়ার তুলি বুলোতে শুরু করেছে মাটিকে চাপা দেওয়া ঘাসের আবরণের ওপরে ।

অবশেষে পৌছলাম এসে পাহাড়ের ওপরে মালভূমিতে। তখন রাত আটটা। কৃষ্ণপক্ষের রাত হ'লেও অন্ধকার তেমন ঘনীভূত নয়। স্বচ্ছ নির্মেঘ আকাশভরা লক্ষ তারা থেকে অস্ফুট আলো ঝ'রে প'ড়ে অন্ধকারকে কিছুটা ফিকে ক'রে দিয়েছে। যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি, তার চারিদিকে গাছপালার ঘন বেষ্টনী থাকলেও জায়গাটি একটি পাথুরে নিস্তৃণ মাঠ। পাথরের স্তূপ দিয়ে আচ্ছন্ন ব'লে সেখানে গাছপালা গজায়নি ।

আমাকে এখানে পৌছে দিয়েই অদৃশ্য হল চিতল হরিণের পাল। এই অন্ধকারের মধ্যে আর এগিয়ে যাওয়া যাবে না, তাছাড়া আমাকে পথ দেখাতে হরিণের পালটিও নেই। কাজেই এখানেই কোথাও আস্তানা নেব ভাবলাম ।

১৬

খচ্চরের পিঠে আমার অন্য সব জিনিসপত্রের সঙ্গে ছোট একটা শোলদারি তাঁবু ছিল। তাঁবুটা নামিয়ে খাটাবার কথা ভাবছি, এমন সময় ছোট একটা কুঁড়েঘর চোখে পড়ল। আমরা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি, তার কাছে একটা পাথরের ঢিবির সামনে দাঁড়িয়ে আছে কুঁড়েঘরটি।

জনমানবশূন্য উদুদা পাহাড়ের মাথায় এই কুঁড়েঘরটি সত্যিই বিস্ময়কর! স্থানীয় আদিবাসীরা ভুলেও যার ধারেকাছে আসতে চায় না, তার ওপর এই ঘরটি তৈরি করার দুঃসাহস কার হল ভেবে পেলাম না। আমার পাঁচ সেলের টর্চটি জ্বেলে কুঁড়েঘরটির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে পাথরের ঢিবিটা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার গায়ে পুরু সিঁদুরের প্রলেপ ও সামনে হাড়িকাঠ দেখে বুঝতে পারি যে এটা একটা দেবস্থান। দেবস্থানের পূজারীর জন্যই হয়তো তৈরি করা হয়েছিল এই কুঁড়েঘরটি। এই পাহাড়ে কেউ না এলেও পূজারী হয়তো বিশেষ বিশেষ লগ্নে আসে এখানে এবং এই কুঁড়েঘরে থেকে পূজার কাজ সমাধা করে। পূজারী এখন নেই এখানে, কুঁড়েঘরটি শূন্য, কিন্তু তার ভেতরটা এমনি ঝকঝকে তকতকে যে, দেখে মনে হচ্ছে যেন সদ্য সে চলে গিয়েছে এখান থেকে।

সে যাই হোক, কুঁড়েঘরটির মধ্যে থাকার লোভ সামলাতে পারি না আমি। খচ্চরটিকে ওখানে টেনে নিয়ে এসে জিনিসপত্র নামিয়ে ঘরের মধ্যে সাজিয়ে ফেলি। ইতিপূর্বে অন্ধকার ঘনিয়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই লণ্ঠন জ্বালিয়ে নিয়ে খচ্চরটির পিঠের সঙ্গে ঝুলিয়ে নিয়েছিলাম। লণ্ঠনটি এখন নামিয়ে ফেলে ঘরের মধ্যে এনে রাখি।

লণ্ঠনের অনুজ্জ্বল অস্ফুট আলোয় ঘরটাকে খুবই পুরানো ব'লে মনে হল আমার। ভ্যালেনটাইন বল্ এখানে এলেও বোধ হয় এই ঘরের

হদিস পাননি—দেবস্থানটিও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। কিংবা এমনও হতে পারে যে, দেখেও তাদের বিষয়ে কিছু লেখেননি বল্-সাহেব।

আমার ভাঁজ করা ক্যাম্পখাটটি খুলে তার ওপর পেতে ফেলি আমার বিছানা, তারপর খাবার ব্যবস্থা করি। প্রায় সপ্তাহখানেকের খাবার আমার সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম—অধিকাংশই টিনে পোরা খাদ্যদ্রব্য এবং পাঁউরুটি। একটি টিন কেটে মাংস বের ক'রে কেরোসিনের স্টোভে গরম ক'রে নিই। তারপর শুরু করি খেতে।

খাওয়া প্রায় অর্ধেক এগিয়েছে, এমন সময় ঘটল একটি বিচিত্র ঘটনা। ঘরের দরজা ঠেলে ভেতরে এসে ঢুকল একজোড়া বড়ো আকারের সম্বর হরিণ। আমার উপস্থিতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে তারা পরস্পর পরস্পরের গা ঘষতে থাকে।

প্রাচীন কাব্য-নাটকে বিস্তর উল্লেখ থাকলেও হরিণ-হরিণীর উদ্দাম প্রেমলীলা এর আগে কখনো দেখিনি। প্রাথমিক সোহাগ-আদর ক্রমশঃ যৌন-মিলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে ঠেকে। যৌন-সঙ্গমে লীন যুগলসত্তা যেন তাদের পশুদেহের সীমা পেরিয়ে যায়। যুগল-মিলনের এই ছবির মধ্যে পাশবিকতা নয়, যেন সৃষ্টির শাশ্বত লীলা উৎসারিত হয়ে ওঠে। কামমোহিত দুটি দেহ যেন অন্তহীন আনন্দের আধার! চেয়ে থাকি মুগ্ধ বিস্ময়ে।

অনেকক্ষণ ধ'রে চলে ওদের মিলনপর্ব। এমন দীর্ঘায়িত রতিক্রিয়া মানুষের ক্ষমতার বাইরে। মিলনে আত্মহারা ঐ সম্বর-সম্বরীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হল, মানুষ যত সভ্য হচ্ছে ততই বিচ্ছিন্ন হচ্ছে জীবনের আনন্দযজ্ঞ থেকে। বেঁচে থাকে তারা বেঁচে থাকার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে!

বেঁচে থাকার মধ্যে যে অনির্বচনীয় সুখ আছে, তা ঐ সম্বর-সম্বরীর কাছ থেকে শিখে নিই রাতের পর রাত। যে কয়দিন ছিলাম আমি ওখানে, প্রতিটি রাত্রেই আসত তারা এই কুঁড়েঘরে। পরস্পরের গা ঘষা, দেহের আঘ্রাণ নেওয়া, সম্বরীর দেহতটে তাপসঞ্চার ক'রে মিলনের

আকাঙ্ক্ষাকে সোচ্চার ক'রে তোলা। তারপর অবসাদহীন পরিপূর্ণ মিলনের পালা।

সম্বর-সম্বরীরা সাধারণতঃ দল বেঁধে থাকে, বিতাড়িত না হ'লে দল ছাড়ে না। দলছুট সম্বর-সম্বরীর এমন মানুষের ঘরে আশ্রয় নেওয়া রীতিমত অস্বাভাবিক। সম্বর শুধু নয়, অন্য জাতের হরিণের মধ্যেও এমন ব্যাপার ঘটতে শোনা যায়নি, বনে অন্য কোন পশুদের মধ্যেও না। কাজেই স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, দল ছেড়ে মানুষের তৈরী ঘরের প্রতি বনের হরিণ-হরিণীর এই পক্ষপাতের কারণ কী।

এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হ'লে সম্বরের দলটিকে খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু তা রীতিমত অসম্ভব ব্যাপার, কারণ সম্বরের বিচরণক্ষেত্র বনের সবচেয়ে দুর্গম গহন অংশে উহ্য আছে।

বিচরণক্ষেত্রের নাগাল না পেলেও হঠাৎ একদিন দেখা পেয়ে যাই ওদের। সেদিন বনের গহন থেকে বেরিয়ে এসেছিল তারা। রীতিমত স্মরণীয় সাক্ষাৎকার।

দেবস্থানটির কাছে একটি খাদ আছে। খনির অবশেষ ব'লে মনে হ'লেও মানুষের হাতের খননের কোন চিহ্ন নেই এখানে। পশুদের পায়ে পায়েই যেন এখানকার মাটি বিশ্লিষ্ট হয়েছে। সম্বরের পালটি সেদিন বিকেলে হঠাৎ এখানে এসে হাজির হয়। এ ওর পাশাপাশি চাটতে থাকে খাদের মাটি।

মাটি চাটলেও মাটি ওদের ভক্ষ্য নয়; ওদের লক্ষ্য হল মাটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন নুন। এখানে মাটির মধ্যে নুনের সমাহরণ ঘটেছে ব'লে ওরা মাটি চাটতে এসেছে। ওরা ছাড়া অন্যান্য প্রাণীও যে এখানকার মাটি থেকে নুন চাটতে আসে, তা আমি পরে লক্ষ্য করেছি। নিরামিষ বা আমিষ-ভোজী কোন বন্য প্রাণীর খাদ্যে নুন থাকে না ব'লে তারা লোনা মাটি বা পাথর চেটে তাদের শরীরের নুনের ন্যূনতা পূরণ করে। লোনা মাটির এই খাদ্যটিকে বলে "সল্ট্-লিক্" (Salt Lick)

"সল্ট্ লিক্"-এ সমবেত সম্বরের দলের মধ্যে দেখা পাই না আমার

পরিচিত সম্বর ও সম্বরীর। তাদের অনুপস্থিতি থেকে বুঝতে পারি যে তারা এই দলের নয়, কিংবা হয়তো বিতাড়িত হয়েছে দল থেকে।

দলটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হল, এই দলের নেতৃত্ব নিয়ে পুরুষ সম্বরদের মধ্যে হয়তো লড়াই হয়েছিল। লড়াইয়ে পরাজিত হয়ে দল থেকে বিতাড়িত হয়েছিল আমার পরিচিত সম্বরটি। দল ছেড়ে সে চলে যেতেই হয়তো সম্বরীটিও দল ছেড়ে তার সঙ্গ নিয়েছে।

দলছুট ঐ সম্বর-সম্বরী দলের চোখে শত্রু, অতএব দলের নজর এড়াবার জন্য পলাতক। এখন চৈত্রের শুরু, শেষ বসন্তের আমেজ জড়ানো এই ঋতু বহু পশুপাখির সহবাস-ঋতু। হয়তো সম্বররাও সহবাস করে এই সময়। দলের বিচরণক্ষেত্র এই সম্বর-সম্বরী দুটির পক্ষে নিরাপদ নয় ব'লে হয়তো এই কুঁড়েঘরটিকে বেছে নিয়েছে ওরা সহবাসের জন্য।

সহবাসের জন্য যে-সব পশুপাখি সহবাস-ঋতুকে মেনে চলে, ঋতুর বাইরে স্তিমিত হয়ে ওঠে তাদের যৌন কামনা। সাধারণত দু'মাসের বেশি স্থায়ী হয় না ঋতুবদ্ধ জীবদের মিলনপর্ব। এই সম্বর-সম্বরীর সহবাস-ঋতুর আশু অবসানের আশা ছিল আমার, ভেবেছিলাম শিগ্‌গিরই শেষ হবে ওদের মিলনের পালা—এই কুঁড়েঘরটি পুরোপুরি আসবে আমার দখলে।

কিন্তু দিন কয়েক বাদে বুঝলাম, আমার হিসাবে ভুল হয়েছে—ঋতুবদ্ধ নয় এই সম্বর-সম্বরীর ভালবাসা, সহবাস-ঋতুর সীমাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে ওদের মিলনের আকাঙ্ক্ষা। ব্যাপারটা বিস্ময়কর হ'লেও সত্য এবং এই সত্যকে মেনে নিয়ে কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাঁবু খাটাই একটি ছাতিম গাছের তলায়।

দেবস্থানের সামনে এই একটি মাত্র ছাতিমগাছ হয়তো মানুষেরই কীর্তি। আশেপাশে যে-সব গাছপালা আছে, তাদের তুলনায় এই ছাতিম গাছের ছায়া অনেক বেশি ঘনীভূত। উচুদা পাহাড়ের এই তিন হাজার ফুট উচ্চতায় গ্রীষ্মের তাপ তেমন প্রখর না হ'লেও এই

ছায়ার আকর্ষণ এড়াতে পারি না। পরে দেখি ছাতিমগাছের এই ছায়া বনের পশুদেরও আকর্ষণ করেছে। রোজই দুপুরে কয়েকটি বারোশিংগা হরিণ এখানে এসে বিশ্রাম করে। মানুষ সম্পর্কে ওদের ভীতি নেই, কাজেই আমাকে বা আমার তাঁবু দেখে বিন্দুমাত্রও ভয় পায় না ওরা।

ছাতিম গাছটির চারপাশে অনেকগুলো মহুয়া গাছ রসালো ফুলের আঁচল বিছিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নির্জন এই পাহাড়ে মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়ে না, কাজেই অধিকাংশ ফুলই প'ড়ে আছে অনাদৃত অবহেলায়। বনের পশুদের ভোগে আসে কি না বুঝতে পারি না। বারোশিংগার যে দলটিকে এখানে বিশ্রাম করতে দেখি, ঐ মহুয়াফুলের প্রতি তাদের কোন আকর্ষণ আছে বলে মনে হয় না। মাঝে মাঝে মহুয়া গাছের তলায় চরতে চরতে ঘাস খেলেও ভুলেও স্পর্শ করে না তারা মহুয়াফুল।

মহুয়াফুল সম্পর্কে হরিণদের আসক্তি না থাকলেও ভালুকদের লোভ আছে, তার আকর্ষণে আসতে পারে তারা। হয়তো রাতের আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে আসে। সত্যিই আসে কিনা তাঁবু থেকে বেরিয়ে যাচাই করব ভাবলাম।

ফুল ঝরিয়ে মহুয়া গাছগুলো রিক্ত হয়ে পড়লেও তাদের ডালপালা সব নতুন কচি পাতায় ভ'রে গিয়েছে। রক্তাভ তার রঙ, মনে হচ্ছে যেন বনের মধ্যে আগুন লেগেছে। আমার তাঁবুর চিক দেওয়া দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এই অগ্নিদাহকে প্রত্যক্ষ করতে গিয়ে আরও আগুনের আভাস পাই অদূরবর্তী পলাশ গাছের সমাবেশের মধ্যে। রক্তরঙের ফুলে আচ্ছন্ন নিষ্পত্র পলাশ গাছগুলি যেন বনের নিবিড় সবুজের মধ্যে অগ্নিস্বাক্ষর আঁকে।

এ আগুন নিষ্প্রভ হয়ে আসে বেলা প'ড়ে আসতে—তারপর সন্ধ্যার ছায়ার ঘেরাটোপের মধ্যে যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে। গাছপালাগুলি শুধু নয়, গাছপালাগুলির মাঝখানকার শূন্যস্থানকেও পূর্ণ করে রাতের আঁধার। মাঝরাতে পুব-আকাশকে উদ্ভাসিত ক'রে ওঠে কৃষ্ণপক্ষের

বাঁকা চাঁদ। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে এই অন্ধকারের নিরবচ্ছিন্নতা—গাছপালাগুলির মধ্যে অসংখ্য কালো বিন্দুর মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে সমস্ত মালভূমি জুড়ে।

কালো বিন্দুগুলোর মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া অন্ধকার যেন দিগন্তবিস্তৃত ধূসর পটে উৎকীর্ণ বিচিত্র একটি ছবি। বাতাস বইছে না, নিস্পন্দ গাছের ডালপালা, আকাশভরা গ্রহ-তারা ও চাঁদের ফালিও যেন এই নিশ্চল স্থিরচিত্রের সঙ্গে সুর মেলানো। এমন সময় ঘটে একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। ঐ বিচ্ছিন্ন অন্ধকার বিন্দুগুলোর কয়েকটি যেন ন'ড়ে ওঠে।

চমকে উঠে ভাল ক'রে তাকাই। চোখের ভুল নয়, সঞ্চরমান কালো বিন্দুগুলি এগিয়ে আসে। প্রথমে মনে হল, আমার তাঁবুই বুঝি ওদের লক্ষ্য, কিন্তু পরমুহূর্তে বুঝতে পারি আমার তাঁবু বা আমি নই, ওদের টেনে নিয়ে আসছে মহুয়া গাছগুলো।

মহুয়া গাছের তলায় এসে স্থির হল ঐ সঞ্চরমান কালো বিন্দুগুলি। এবার দেখতে পাই ওদের। নিবিড় কালো রঙের কয়েকটি ছোটবড় নানা আকারের ভালুক। গোটা একটি ভালুক পরিবার বলা চলে। ঝুঁকে পড়ে তারা গাছের তলায় বিছানো মহুয়াফুলের স্তরের ওপরে। দেখতে দেখতে বুঁদ হয়ে পড়ে তারা মহুয়াফুলের রসে—আমাকে যেন দেখতেও পায় না।

এমন সময় ঘটে একটি বিপর্যয়। বনমানুষের মত কী যেন একটি ভালুকদের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় তারা।

ভালুকের চোখেও ভয়ঙ্কর! কী ওটা?

আমার দৃষ্টি বিস্ফারিত ক'রে চেয়ে থাকি তার দিকে।

ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখি, বনমানুষ বা অন্য কোন জন্তু নয়, মানুষ। একটা মানুষকে ভালুকদের ভয় পাওয়াটা বিস্ময়কর নয়—হয়তো ভালুকের চোখে মানুষ একটা ভয়ঙ্কর জানোয়ার। শুধু কি ভালুক, যে কোন প্রাণীর চোখেই মানুষের চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কিছুই

নয়। হিংস্রতার নিরিখে মানুষের চেয়ে হিংস্র প্রাণী আর হয় না, মানুষের স্বভাব হল অকারণ হিংস্রতা। হত্যার জন্য হত্যা, শিকারের নেশা মেটাবার জন্য শিকার অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে নেই.

ভালুকের চোখে যতই ভয়ঙ্কর হোক না কেন, আমার কাছে সে আমারই স্বগোত্র মানুষ। এই নির্জন মালভূমির মধ্যে আর কোন মানুষের অস্তিত্ব কল্পনাও করতে পারিনি। কারণ স্থানীয় মানুষদের ভয়ের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে এখানে আসবার দুঃসাহস তার হল কী ক'রে তা জানার কৌতূহল আমাকে তার দিকে টেনে নিয়ে যায়।

তার সামনে এসে দাঁড়াতে মুখ তুলে তাকাল সে, অস্পষ্ট জ্যোৎস্না-তেও সুস্পষ্ট দেখতে পেলাম তাকে। দেখামাত্র চমকে উঠলাম। এমন বীভৎসতা কল্পনার অতীত!

খালি গা, পরনে খাটো ধুতি, কালো পাথর, কোঁদা মূর্তির মত দেহ, কিন্তু মুখখানা যেন বিকৃতির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। একটা চোখ নেই, শূন্য কোটর যেন গাঢ় কালো একটি বৃত্ত। এক পাটি দাঁত নেই, নাকের জায়গায় আছে দুটি ছোট ছোট গর্ত। দু-গালের মাংসপেশী উৎপাটিত, একটা কান নেই। সব মিলিয়ে এমনই ভয়াবহ বিকৃতি যে, দেখামাত্র আঁৎকে উঠতে হয়। আমিও আঁৎকে উঠি, মৃদু একটা আর্তনাদ বেরিয়ে আসে আমার গলা থেকে।

—ভয় পাবেন না।. লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে বললে, যা দেখছেন, তা একটি ভালুকের কীর্তি। এখানে ব'সে মহুয়াফুল কুড়োতে গিয়ে তার খপ্পরে পড়েছিলাম। এখন তার নিজের কীর্তি দেখে সে ভয় পাচ্ছে ব'লে আপনি ভয় পাবেন না যেন।

আমি বললাম, যে তোমাকে আহত করেছে তাকে চিনে রেখেছ তুমি?

—হ্যাঁ, সে-ই তো পালের গোদা।

—কিন্তু সে তো একা নয়, দলসুদ্ধ সকলেই পালিয়েছে ভয় পেয়ে।

—তা তো পাবেই। আমার এই মুখের চেয়ে বীভৎস কিছু কি কেউ ভাবতে পারে? আপনি নিজেই বলুন না।

—আমি আর কী বলব! তোমার মুখের দিকে তাকাতেই পারছি না। কিন্তু তুমি কী করছ এখানে? এখানকার লোকেরা তো এদিকে ঘেঁষতেই চায় না।

—এখানকার দেওতার থানের পুরোহিত আমি। চাংভাগারের রাজাসাহেবের হুকুমে এখানকার দেওতার সেবার কাজে বহাল হয়েছি। রাজাসাহেবকে বলেছি আমার চাকরিটাকে পাকা ক'রে দিতে, কারণ এ মুখ নিয়ে তো আমি লোকালয়ে যেতে পারি নে। জখম হবার ঠিক আগে বিয়ে করেছিলাম। আমার নতুন বিয়ে করা বউকে তার বাপের বাড়িতেই রেখেছি। আমার এ মুখ দেখে সে সইতে পারবে না ব'লে তার কাছে যাই নে আমি।

—লোকালয়ে যেতে পার না তো তোমার চলে কী ক'রে? মানে খাবার-দাবার যোগাড় কর কী করে?

—রাজাসাহেবের লোকেরাই যোগাড় ক'রে দেয়। তারা আমার চাল ডাল তেল নুন পাহাড়ের নিচে এক জায়গায় রেখে যায় সপ্তাহে একদিন, তাছাড়া রকমারি ফল ফলে এখানকার বনে, মহুয়াফুলও আছে। কাজেই, কোন কষ্ট নেই আমার।

—এখানে থাকতে ভয় করে না তোমার? এখানকার আদিবাসীদের কাছে এ তো একটা ভয়ানক জায়গা। মাটির নিচে দৈত্য না দানব কারা নাকি আছে—

—ঠাট্টা নয়, বাবুজী, তাঁরা আছেন। আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে লোকটা, চোখে অবশ্য দেখা যায় না, মাঝে মাঝে মাটির তলায় তোলপাড় সৃষ্টি ক'রে তাঁরা জানান দেন যে তাঁরা আছেন। এখানকার দেওতার থানের পূজারী আমি, তেনারাই দেওতা, ঐ পাথর—টিলায় তেনাদের পুজোই করি—আমাকে কি তেনাদের ভয় পেলে চলে! তাছাড়া আমি নিজেও তো একটা ভয়ঙ্কর—যে ভয়ঙ্কর, সে কাউকে ভয় পায় না। কিন্তু বাবুজী, এই ভয়ানক জায়গায় আপনি এসেছেন কেন? আপনার কি কোন ভয়-ডর নেই?

—থাকবে না কেন, পুরোমাত্রাতেই আছে। মৃদু হেসে বললাম

আমি, কিন্তু অকারণে ভয় আমি পাই না। পাতালের দৈত্য বা অদৃশ্য দানব আমার কোন ক্ষতি করবে ব'লে মনে করি না।

—আমাকেও ভয় পান না! এখানকার বনে যারা থাকে, মানে ভালুক, বুনো মোষ, বাঘ—এদেরও ভয় পান না?

—না, কারণ তোমার বা এখানকার জন্তু-জানোয়ারদের সঙ্গে কোন শত্রুতাই নেই আমার।

—তা হ'লে আমরা আপনার বন্ধু! আমার হাতে হাত রেখে লোকটা সোচ্ছ্বাসে ব'লে ওঠে, বলুন কী করতে পারি আপনার জন্য? নিশ্চয়ই নিছক বেড়াবার জন্য আসেননি আপনি এখানে—কোন একটা উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছেন—বলুন কী চাই আপনার? মাটির তলার ধনদৌলত, না মাটির ওপরকার জড়িবুটি।

—সে-সব কিছু নয়। আমি জবাব দিলাম, একজন মানুষকে খুঁজছি আমি। পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়সের একজন বাঙালী বাবু, তার সঙ্গে একজন আদিবাসী মেয়েও আছে। বাবুটির নাম শুভ্রজ্যোতি, মেয়েটির নাম মানকী।

—ওদের কথা শুনেছি আমি বাবুজী। উত্তেজিত স্বরে বললে লোকটি, ওদের তু'জনকেই পুড়িয়ে মারার হুকুম হয়েছে।

—এ হুকুম কি তুমিও পেয়ে গিয়েছ? ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

—হ্যাঁ বাবুজী—ওরা তু'জন যদি এখানে লুকিয়ে থাকে, ওদের তু'জনকে খুঁজে বের ক'রে পুড়িয়ে মারার হুকুম পেয়েছি।

—তা হ'লে তো তোমাকে ওদের কথা ব'লে অন্যায় করেছি আমি! আর্তস্বরে ব'লে উঠলাম আমি।

—না বাবুজী না, কোন অন্যায় করেননি আপনি ওদের কথা ব'লে। ওরা যদি সত্যিই এখানে লুকিয়ে থাকে, ওদের কোন ক্ষতি হবে না। আমার সমাজ নেই, সংসার নেই, সবাই আমায় ত্যাগ করেছে, কাজেই ওদের হুকুম আমি মানি না, মানব না। তা ছাড়া, ওরা তু'জন কোন অন্যায় করেছে ব'লে তো আমি মনে করি না।

দলছুট সম্বর জোড়াকে যেমন আমার কুঁড়েঘরে ঠাঁই দিয়ে দলের আক্রোশ থেকে আগলে রেখেছি, তেমনি ওদেরও আগলে রাখব এখানে। কিন্তু ওরা কি আছে এখানে—মানে এরকম একটা ভয়ানক জায়গায় আশ্রয় নেবার সাহস কি ওদের হবে?

—নিশ্চয়ই হবে। আদিবাসীদের হাত থেকে বাঁচতে হ'লে এখানেই ঠাঁই নিতে হবে ওদের।

—তা যদি হয়, কোন ভয় নেই ওদের। আপনি ওদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন, আমি সাহায্য করব আপনাকে। আপনার কাছাকাছিই আছি আমি—দিনের আলোয় গা ঢাকা দিয়ে থাকি, রাতে বেরোই—আপনি হাঁক দিলেই চ'লে আসব।

—তোমার ঐ কুঁড়েঘরের মধ্যে তো তুমি নেই।

—না নেই, আমি থাকলে ঐ সম্বর-সম্বরীদুটির বড়ো অসুবিধে। দেখেছেন তো ওরা দু'জনে দু'জনকে ভালবাসে···ওদের আইন-কানুন ছাপিয়ে গেছে ওদের ভালবাসা।

—আইন-কানুন? ভালবাসার আইন-কানুন আছে নাকি? অবাক হয়ে প্রশ্ন করি আমি।

—নিশ্চয়ই আছে। লোকটা জবাব দিল, বনের পশুরা সব সেই আইন দিয়ে বাঁধা। সম্বর-সম্বরীদের ভালবাসার সময় হল শীতকাল। শীতকাল শেষ হ'লেই শেষ হয় ওদের ভালবাসার পালা—তারপর দু'জনে দু'জনের সঙ্গ আর খোঁজে না, ওদের হাবভাবে মনে হয় কেউ যেন কাউকে চেনেই না। কিন্তু এরা দু'জন সে সব নিয়ম না মেনে মাসের পর মাস দু'জনে দু'জনকে ভালবেসে যাচ্ছে। তার জন্যই দল ছেড়ে পালিয়েছে, আমি যদি আমার কুঁড়েঘরে ওদের ঠাঁই না দিতাম—ওদের দু'জনকে ওরা মেরেই ফেলত!

—তোমার কুঁড়েঘর ছেড়ে আছ কোথায় তুমি?

—যেখানেই থাকি না কেন, আপনি তো আর যাবেন না সেখানে—কাজেই নাই বা জানলেন কোথায় আছি। দরকার হ'লেই ডাক দেবেন, আপনার ডাক শুনেই চ'লে আসব।

—কিন্তু ডাক দেব কী ব'লে? তোমার নাম ছাড়া তো ডাকতে পারি নে তোমাকে।

—নাম! লোকটার বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে, নাম দিয়ে কী হবে হুজুর! আমার নাম ধ'রে কেউ তো ডাকে না। আমার আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে আমার নামকেও ছেড়েছি আমি। নামে কিছু এসে যায় না বাবুজী, যে নামে খুশি ডাকুন আমাকে, আমি সাড়া দেব।

—ঠিক আছে, তোমাকে আমি পাহাড়ী বলে ডাকব।

—ঠিক আছে, তাই হবে। এখন আপনি যান বাবুজী, আমাকে আমার কাজ করতে দিন। মহুয়াফুল কুড়িয়ে পুজোয় বসব—দিনের আলো ফুটে ওঠার আগেই আমার কাজ সারতে হবে।

১৭

দিনের আলো ফুটে ওঠার আগেই উধাও হল পাহাড়ী। সে কোথায় থাকে তা জানার জন্য উদগ্র একটা কৌতূহল অনুভব করলাম। তাঁবু থেকে বেরিয়ে চ'লে এলাম দেবস্থানে। বেলে পাথরের টিলার সামনে অনেকগুলো নুড়ি সাজানো আছে। সর্বত্র সিঁদুরের দাগ। সামনে পাথরের চাতালে পুজোর উপকরণ সাজানো। রাশীকৃত পলাশ, কৃষ্ণচূড়া ও কুরচি এবং অজস্র মহুয়াফুল। ফুলের স্তূপ থেকে মহুয়াফুল খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল কয়েকটি কাঠবিড়ালী। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই পালিয়ে গেল তারা।

দেবস্থান থেকে একটু দূরে শালবন। ঘন সন্নিবদ্ধ বড়ো বড়ো শালগাছের ফাঁকে ফাঁকে আছে পলাশ ও পিয়াশাল। কিছু কিছু আমলকী গাছও দেখা যাচ্ছে। ঘন শালবনের তলায় আর এক অরণ্য সৃষ্টি করেছে ঝ'রে পড়া শুকনো পাতার মেলা। তাদের মধ্যে সাপ বিছে লুকিয়ে থাকতে পারে ব'লে খুব সাবধানে পা ফেলে চলি। খানিকটা হেঁটে যাওয়ার পর একটি ফোয়ারা দেখতে পাই। বেলে পাথরের স্তর ভেদ ক'রে উৎসারিত হচ্ছে স্বচ্ছ জলের ধারা। এক হাজার মিটারের বেশি এখানকার উচ্চতা। উচ্চতার দরুন সূর্যের তাপে তেমন প্রখরতা নেই, দক্ষিণ বাতাস স্নিগ্ধতার আমেজ বয়ে নিয়ে আসে। বাতাসে কাঁপে ঝরাপাতার স্তূপ—মৃদু মর্মরধ্বনি জাগে কম্পিত পত্রপুঞ্জের বক্ষ ভেদ ক'রে। যেন একটা উদাস করুণ গানের সুর। হঠাৎ এই ঝরাপাতার মর্মরধ্বনির সঙ্গে সুর মিলিয়ে দৌড়ে আসে অতি ক্ষুদ্র আকারের একটি হরিণ। তার গায়ের চামড়ার বাদামী রঙ যেন ঝরাপাতার রঙের সঙ্গে মিশে যায়—তার নড়াচড়া যেন শুকনো পাতার স্পন্দন।

আমাকে দেখেও যেন দেখে না হরিণটা—আমার দিকে ভ্রূক্ষেপও না ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে আমার কাছাকাছি। দাঁড়িয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে এদিক ওদিক তাকায়, যেন কেউ অনুসরণ করেছে তাকে।

খুব কাছের থেকে হরিণটাকে খুব ভাল ক'রে দেখার সুযোগ পাই আমি। চিংকারা। আকারে "মাউস-ডিয়ার"-এর চেয়ে বড় হ'লেও সবচেয়ে ক্ষুদ্রকায় হরিণ। আমার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে ভালভাবে তাকে দেখার সুযোগ দেয় আমাকে। লম্বায় প্রায় ত্রিশ ইঞ্চি, উচ্চতায় পনের ষোল ইঞ্চির বেশি নয়। দেহের অনুপাতে শিংদুটি বেশ বড়ো—প্রায় দশ থেকে বারো ইঞ্চি। চোখ দুটি নিবিড় কালো—সত্যিকারের কালো হরিণ চোখ। শুকনো জায়গায় থাকার অভ্যাস—জল বিনা একটানা বহুদিন বেঁচে থাকার ক্ষমতা আছে। মানুষকে এড়িয়ে চললেও শিকারীর খপ্পরে প'ড়ে যায় সহজেই। তাদের মারতে মারতে প্রায় বিরল ক'রে এনেছে অকারণ হিংসায় উন্মত্ত শিকারীরা।

এ হেন বিরল প্রাণীকে এত কাছে থেকে এতক্ষণ ধ'রে দেখতে পাওয়া খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার। মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকি।

আমি মুগ্ধ। কিন্তু চিংকারা ভীত, সন্ত্রস্ত। মুখ ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে। বোধ হয় দেখতে চাইছে, তার অনুসরণকারী কতদূর এগিয়ে এসেছে।

চিংকারাটির দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে তার অনুসরণকারী জন্তুটিকে দেখতে পাই। একটি বড়ো আকারের নেকড়ে বাঘ। নেকড়ে বাঘটি আমাকে দেখতে না পেলেও বোধহয় চিংকারাটিকে দেখতে পায়। সে ধেয়ে আসে এদিকে।

চোখের নিমেষে চিংকারাটি শুকনো পাতার স্তূপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। শুকনো পাতার রাশির সঙ্গে মিলেমিশে এমনি একাকার হয়ে পড়ে যে, তাকে দেখতে পায় না নেকড়ে বাঘটি।

নেকড়েটি বিভ্রান্ত। চোখের নিমেষে চিংকারাটি গেল কোথায়, বোধ হয় ভেবে পায় না সে। হতবুদ্ধির মত এদিক ওদিক তাকায়। বাতাসে গন্ধ শোঁকে—কিন্তু শুকনো পাতার স্তূপ চিংকারাটিকে যেমন আড়াল ক'রে রাখে, তেমনি তার মন মাতানো গন্ধ চিংকারাটির গায়ের

গন্ধকেও চাপা দেয়। খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর হতাশ হয়ে চ'লে যায় নেকড়েটি। সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে যায় চিংকারাটি—তাকে আর দেখতে পাই নে।

শালবনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে ঢুকে পড়ি ঘাসবনের মধ্যে। ঘাসবনের মধ্যে আকর্ষণীয় কিছু না থাকলেও তার মধ্যে অস্পষ্ট পথের আভাস আছে। বনের পশুদের পায়ে তৈরি এই পথ কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে জানি না, তবু এই পথ ধ'রেই চলতে থাকি। মানুষের কোন পায়ের চিহ্ন পড়েনি এখানে, এখানে যাতায়াত করতে হ'লে পশুদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে আমাকে।

বনের পশুদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেও দেখা পাই না তাদের। হয়তো আমার উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে গা ঢাকা দিয়েছে তারা ঘাসবনের মধ্যে। খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার পর আমার অনুমানের যথার্থতাকে প্রত্যক্ষ করি ঘাসবনের স্পন্দনের মধ্যে। বাতাস বইছে না, গাছের পাতায় কোন কাঁপন নেই, কিন্তু গতির আবেগে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে আমার দুপাশের ঘাসের আবরণ। চোখে দেখতে না পেলেও বুঝতে পারি, কারা যেন এগিয়ে যাচ্ছে আমার সঙ্গে সঙ্গে।

ঘাসের আবরণের আড়ালে নিজেদের যতই গোপন রাখার চেষ্টা করুক, জায়গায় জায়গায় আত্মপ্রকাশ করে তারা হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত। "ব্ল্যাক বাক্" বা "কৃষ্ণসার হরিণ।" তাদের চামড়ার কালো রঙ যেন বনের নিবিড় ছায়ার সঙ্গে সুর মেলায়। অপরিসীম ক্ষমতা এদের দৃষ্টি এড়াবার।

হঠাৎ স্তব্ধ হয় এদের গতি। পুরো দলটারই অগ্রগতি অকস্মাৎ যেন মন্ত্রবলে বন্ধ হয়ে যায়। আমিও থমকে দাঁড়াই। মনে হল কোন একটা বিপদ যেন অপেক্ষা করছে সামনে।

কিন্তু এরা থেমে গেলেও ঘাসের কাঁপন থামে না। এদের থেমে যাওয়াকে লক্ষ্য না ক'রেই এগিয়ে যায় একটি অসতর্ক দুঃসাহসিকতা। কৃষ্ণসারের পালের হুঁশিয়ারিকে উপেক্ষা ক'রে সে বেরিয়ে আসে ঘাস-

বনের আড়াল থেকে—কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই স্পষ্ট দেখতে পাই তাকে।

শুয়োর হরিণ বা "হগ্ ডিয়ার"। পেছনের দিকটা অবিকল শুয়োরের মত দেখতে। অনেকের ধারণা শুয়োর ও হরিণের সংমিশ্রণে এই শুয়োর হরিণের সৃষ্টি। কিন্তু আসলে শুয়োরের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই—চেহারার দিক থেকে যতই সাদৃশ্য থাকুক। হরিণেরই একটা জাত ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু অন্যান্য হরিণের তুলনায় অনেক বেশী বোকা—আর সকলের থেমে পড়ার কোন অর্থ ধরার চেষ্টা না ক'রেই এগিয়ে চলেছে।

চলেছে অনেকটা নিস্পৃহ ভঙ্গীতে। দলছুট একলা হরিণের বিশেষত্বই বুঝি এই নিজের প্রাণ সম্পর্কে উদাসীনতা।

ঠিক এমনি সময় ঘটল দুর্ঘটনাটি। হরিণটির দিক থেকে দুর্ঘটনা অবশ্য নয়, বন্য প্রকৃতির বুকে নিত্যই ঘটছে এমনি ঘটনা।

একটা পুঞ্জীভূত বিদ্যুৎপুঞ্জ যেন লাফিয়ে পড়ে হরিণটির ওপরে। একটা মাঝারি আকারের চিতাবাঘ। বনের নিবিড় ছায়ার মধ্যে হলদে রঙের আবর্ত সঞ্চার ক'রে হরিণটিকে রক্তাক্ত ক'রে তোলে। চোখের নিমেষে গভীর একটা ক্ষত সৃষ্টি হয় তার ঘাড়ের কাছে। অতর্কিত নিঃশব্দ আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে মারা পড়ল হরিণটা। দেখতে দেখতে রক্ত-রঙিন হয়ে ওঠে সবুজ ঘাসে-ঢাকা মাটি।

সঙ্গে সঙ্গে ঘটে একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা। ঘাসবনের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে ত্রিশ চল্লিশটি কৃষ্ণসার হরিণ—ঘিরে ফেলে তারা চিতা-বাঘটিকে। পালাবার চেষ্টা করে চিতাবাঘটি, কিন্তু কৃষ্ণসারদের আক্রমণাত্মক ভঙ্গী তাকে ভয়ে একেবারে নিশ্চল করে দেয়।

শিং উঁচিয়ে একযোগে চিতাবাঘটিকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয় কৃষ্ণসারের দল। চিতাবাঘটির হিংস্রতার জবাব দিতে চায় হিংস্রতা দিয়ে। শূকর-হরিণটির হত্যার প্রতিবাদে চিতাবাঘটিকে হত্যা করবে তারা।

কিন্তু কৃষ্ণসারের দল ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই গর্জে ওঠে বন্দুক।

সঙ্গে সঙ্গে ঐ চিতাবাঘ এবং কৃষ্ণসারের দল শুধু নয়, আমিও চমকে উঠি।

এই নির্জন নিষিদ্ধ বনকে স্থানীয় আদিবাসীদের মত শিকারীরাও এড়িয়ে চলে ব'লে জানতাম। কাজেই এই বন্দুকের গর্জন অভাবিত শুধু নয়, অসম্ভব ব'লে মনে হল। মনে হল, বন্দুকের গর্জন নয়, মাটির তলার কোন বিস্ফোরণ বা পাহাড় থেকে ধস্ নামার শব্দ। কিন্তু পরমুহূর্তে আবার গর্জে ওঠে বন্দুক। স্পষ্ট বন্দুকেরই আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে কৃষ্ণসারের দল এবং পালিয়ে যায় চিতাবাঘটি।

হরিণের পাল এবং চিতাবাঘটির ভয় আমার মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিল, পালিয়ে যাওয়ার ঝোঁক আমারও চাপে। কিন্তু পরমুহূর্তে মনে হল শিকারীটি আমারই জাতভাই—শুভ্রজ্যোতিও হতে পারে—কাজেই দাঁড়িয়ে থেকে প্রতীক্ষা করি তার জন্য।

রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষায় বহুক্ষণ কেটে গেল আমার, কিন্তু এল না কেউ। তখন বুঝতে পারি, শিকারের মতলবে, আক্রমণোদ্যত কৃষ্ণসারদের ছত্রভঙ্গ করার জন্যই বন্দুক ছোঁড়া হয়েছে। অর্থাৎ বন্দুক যে ছুঁড়েছে—চিতাবাঘটিকে বাঁচাবার জন্যই ছুঁড়েছে।

কিন্তু কে এই চিতাবাঘের বন্ধু? বনের মধ্যে বিশেষ ক'রে ঘাসবনের মধ্যে বিস্তর খোঁজাখুঁজি ক'রেও হদিস পাই নে তার। সে যাই হোক, বহুক্ষণ ব্যর্থ অনুসন্ধানের পর এইটুকু বুঝতে পারি যে, এই নেপথ্যচারী বনের মধ্যে প্রচ্ছন্নই থাকতে চায়, দেখা সে দেবে না কিছুতেই।

বনের মধ্যে যে আত্মগোপন ক'রে আছে, তার দেখা পাওয়া প্রায় অসম্ভব বললেই হয়। সে যদি দেখা না দেয়, কারুর সাধ্য নেই তাকে দেখার। বনটাকে ঘিরে ফেলে হাঁকা লাগালে অবশ্য বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু তার জন্য দরকার অন্ততঃপক্ষে দেড়শো দুশো জন মানুষ। এখানে একজন মানুষকেও আনা যাবে না, কাজেই

দেড়শো দুশো জনকে দিয়ে বনের মধ্যে ব্যূহরচনার কল্পনা দিবাস্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়।

শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে আমার তাঁবুতে ফিরে যাবার উদ্যোগ করছি, এমন সময় ফিরে এল চিতাবাঘটি। সে একা নয়, তার সঙ্গে এল আর একটি চিতাবাঘ—বোধ হয় তার সঙ্গিনী, চিতাবাঘিনী। তার পেছনে এল চারটি বাচ্চা চিতাবাঘ, নিঃসন্দেহে তাদেরই শাবক। তারা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল শূকর-হরিণের মৃতদেহের ওপর।

পুরো একটি চিতাবাঘ পরিবারের যৌথ ভোজ দেখতে অনাবিল আনন্দ অনুভব করি। আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্যটি সেই বনের গাছপালার সমাবেশের সঙ্গে সুর মেলায়। মনে মনে ঐ চিতাবাঘ প্রেমিকের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করি আমার এই অপরূপ অভিজ্ঞতার জন্য। চিতাবাঘ শুধু নয়, বনের সব প্রাণীরই বন্ধু সে। বনের সব প্রাণীর আত্মরক্ষা ও বেঁচে থাকার অধিকারকে সে মেনে নিয়েছে।

কিন্তু কে সে? আমার তাঁবুর দিকে ফিরে যেতে যেতে ভাবি। সে কি শুভ্রজ্যোতি? আড়াল থেকে নিশ্চয়ই সে লক্ষ্য করেছে আমাকে। আমাকে দেখেও কি দেখা দেবার আগ্রহ অনুভব করছে না সে?

১৮

তাঁবুতে ফিরে এসে দেখি ক্যাম্প টেবিলের ওপরে কে যেন শাল-পাতায় মুড়ে ভাত ও ঝলসানো আস্ত মুরগী রেখে গিয়েছে। বোধ হয় পাহাড়ীর কাজ। আমি যখন তার আস্তানা খুঁজতে বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তখনই হয়তো এ-সব রেখে গিয়েছে সে। সে বলেছিল ডাকলেই চলে আসবে। তাঁবু থেকে বেরিয়ে হাঁক দিলাম, পাহাড়ী !

—বলুন বাবুজী। জবাবটা খুব কাছের থেকে এলেও কোথা থেকে এল বুঝতে পারি না।

—কোথায় আছো পাহাড়ী ?

—বেশি দূরে নয়—কাছেই আছি।

—কাছেই আছ ! কিন্তু আজ সারা সকাল খোঁজাখুঁজি ক'রেও তোমার আস্তানাটি খুঁজে পাইনি।

—পাবেন না বাবুজী—সে চেষ্টাও করবেন না।

—আমার তাঁবুর মধ্যে ভাত ও মাংস কি তুমি রেখে গিয়েছ পাহাড়ী ?

—যে-ই রেখে যাক, চটপট গরম করে খেয়ে নিন।

—ঘণ্টাখানেক আগে বন্দুকের আওয়াজ শুনেছিলাম, তুমি আমি ছাড়া বোধ হয় আর কেউ আছে এখানে। হয়তো শুভ্রজ্যোতি—

—না বাবুজী। পাহাড়ী বাধা দিয়ে বললে, এ আমার বন্দুকের আওয়াজ। চিতাবাঘটাকে হরিণদের আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্য ফাঁকা আওয়াজ করেছিলাম। আমার আস্তানা থেকেই করেছিলাম। এখান থেকে সব দেখা যায়।

—তোমার আস্তানা থেকে সব দেখা যায় ! আমি বিস্ময় প্রকাশ

করি : কিন্তু চারদিকে ঘন বনের মধ্যে তো কয়েক হাত দূরের জিনিসও দেখতে পাই নে।

—আপনি না পেলেও আমি পাই—আমার সে ক্ষমতা আছে। কিন্তু—কী ক'রে তা জানতে চাইবেন না। যান, খেয়ে নিন চটপট—তারপর শুরু করুন আপনার কাজ। মানে, খুঁজতে শুরু করুন আপনার বন্ধুকে।

—তুমিও এস না—তুজনে মিলে একসঙ্গে খুঁজব।

—না, বাবুজী না—সঙ্গী হিসেবে চাইবেন না আমাকে। এক মুহূর্তের জন্যও সইতে পারবেন না আমাকে। কাল রাতের অন্ধকারে ভাল ক'রে দেখতে পাননি, দিনের আলোয় দেখলে হয়তো অজ্ঞানই হয়ে যাবেন।

—মানুষ হিসাবে তোমাকে চিনে নিয়েছি, তোমার বাইরের চেহারা আমাকে বিচলিত করবে না একটুও। এস না ভাই—পরীক্ষা ক'রে দেখ।

—সে হয় না বাবুজী! দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে পাহাড়ী। আপনি সইতে পারলেও বনের পশুরা পারবে না। ওদের বিশ্রামের সময় এটা—আমি আমার আস্তানা থেকে বেরিয়ে এলে ওদের বিশ্রামে বিঘ্ন ঘটবে।

এরপর আর কোন কথা হয় না আমাদের। খাওয়া-দাওয়া সেরে বেরিয়ে আসি তাঁবু থেকে। আমার হাতে বল্-সাহেবের বইয়ের ফটোস্ট্যাট কপি।

বল্-সাহেবের লেখা বিবরণের সঙ্গে মিলিয়ে একটা প্রকাণ্ড গাছকে সনাক্ত করলাম। দেবস্থানের কাছেই আছে গাছটি। এখানকার সব-চেয়ে উঁচু গাছ, অসংখ্য ডালপালা ও পাতায় সমাচ্ছন্ন যেন বৃহদারণ্যক বনস্পতি। এখানকার সব গাছকে ছাপিয়ে গিয়েছে তার উচ্চতা। বল্-সাহেব এ-গাছের বর্ণনা দিলেও নাম দেননি। আকার আয়তন ও পাতার সমাবেশ দেখে গাছটাকে "বৃদ্ধ-নারকেল (Sarculia Alata)"

ব'লে মনে হল। প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি. সোজা খাড়া হয়ে উঠেছে আকাশের দিকে।

বল্-সাহেবের ভ্রমণবৃত্তান্তে এই গাছটির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, কারণ এই গাছটি তাঁর প্রাণ বাঁচিয়েছিল। এই গাছের চারপাশে ব্যাসল্ট পাথর পরীক্ষা করছিলেন তিনি, এমন সময় তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল একটি কোৎরা বা barking deer. ছোট শিং-ওয়ালা ক্ষুদে হরিণ, উচ্চতায় প্রায় দু'ফুট। কুকুরের মত ডাকে ব'লে ইংরেজিতে barking deer বলা হয়। বল্-সাহেবকে দেখামাত্র ভয়ে ডেকে উঠেছিল এই কোৎরাটি। শুনে চমকে উঠেছিলেন বল্-সাহেব, অতটুকু দেহ থেকে অমন বিকট শব্দ বের হয় কী ক'রে ভেবে পাননি। ভয়ে ডাকতে থাকলেও সরে যায়নি সে এবং ছিল বল্-সাহেবের রাইফেলের সহজ নাগালের মধ্যে। কাজেই রাইফেল তুলে এক গুলিতেই তাকে ধরাশায়ী করেন তিনি।

রাইফেলের গুলিতে কোৎরাটি ধরাশায়ী হতেই চারপাশের লতাঝোপের মধ্যে আলোড়ন জাগে। লতাঝোপের সঙ্গে মিশে ছিল বেত ও ঝাঁটিগাছ—তারাও স্পন্দিত হতে থাকে প্রবল বেগে। তারপর তাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে দশটি "গাওর" বা বুনো গরু। বাইসনের সমগোত্র হ'লেও আকারে বাইসনের চেয়ে বড়ো। উচ্চতায় প্রায় সাত ফুট—গায়ের চামড়ার রঙ ঘন কালো হ'লেও পা চারটি সাদা, দেখে মনে হয় যেন চার পায়ে চারটি সাদা মোজা পরে আছে। অর্ধচন্দ্রাকৃতি শিং, মাটিতে পা ঘষতে ঘষতে শিং উঁচিয়ে এগিয়ে আসতে থাকে বল্-সাহেবের দিকে। ভয় পেয়ে রাইফেল তুলে গুলি করেন বল্-সাহেব। কাঁপা হাতে ছোঁড়া গুলি দশটি গাওর-এর একটিকেও স্পর্শ করে না। কিন্তু গুলির আওয়াজে উত্তেজিত হয়ে ওঠে গাওর-এর পাল এবং আরও গাওর বেরিয়ে আসে বেতবন ভেদ ক'রে। দেখতে দেখতে প্রায় চব্বিশ পঁচিশটি গাওর ঘিরে ফেলে বল্-সাহেবকে। তিনি বুঝতে পারেন তাঁর রাইফেল, দোনলা বন্দুক বা পিস্তল কোন আগ্নেয়াস্ত্রই এই চব্বিশ পঁচিশটি গাওর-এর সম্মিলিত হিংস্রতা থেকে

বাঁচাতে পারবে না তাঁকে, এদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় ঐ বৃদ্ধ-নারকেল গাছটাতে উঠে পড়া।

স্বাভাবিক অবস্থায় এই খাড়া গাছের গুঁড়ি বেয়ে ওঠার চেষ্টা হয়তো করতেন না বল্-সাহেব, চেষ্টা করলেও পারতেন না। কিন্তু এখন এই সংকট-মুহূর্তে গাছটির দুরারোহতা বিবেচনা না ক'রে উঠতে শুরু করেন তিনি। উঠতে উঠতে অনেক দূর উঠে পড়েন আতঙ্কের তাড়নায়। পরে গাওরের দল চলে যাওয়ার পর গাছটার দুরারোহতা প্রকট হয়ে ওঠে তাঁর কাছে—নামতে গিয়ে খাড়া পাহাড়ের উৎরাই বেয়ে অবরোহণের অভিজ্ঞতা হয় তাঁর।

বৃদ্ধ-নারকেল গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বল্-সাহেবের একশো বছর আগেকার সেই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতাকে যেন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করি। গাছটি এখনো আছে, বটগাছের মত এরও সুদীর্ঘ পরমায়ু। কিন্তু এর কাছাকাছি গাওরদের আস্তানা কি আজও আছে?

বৃদ্ধ-নারকেল গাছটাকে ছাড়িয়ে ঘন অরণ্যের নির্জনতার মধ্য দিয়ে হাঁটতে থাকি। হাঁটতে হাঁটতে ঝাঁটিগাছ ও বেতবনের ঘন সমাবেশের মধ্যে যেন ডুবে যাই। পথ নেই। দুর্ভেদ্য বেতবন ঠেলে এগিয়ে যেতে থাকি। হঠাৎ একটা সুঁড়িপথ চোখে পড়ে। বন্য প্রাণীদের যাতায়াতে এ-পথের সৃষ্টি। এ-পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একটা প্রচণ্ড রকম বাধা পাই। একটা অতলস্পর্শী খাদ এই পথ ও বনের নিরবচ্ছিন্নতাকে বিশ্লিষ্ট করে নিচে নেমে গেছে। খাড়া উৎরাই একটা সবুজ ঢলের মত নেমে গিয়েছে প্রায় এক হাজার ফুট নিচে। নিচে উপত্যকার মধ্য দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটি পাহাড়ী নদী। বল্-সাহেবের ভ্রমণবৃত্তান্তে তার উল্লেখ আছে। নদীটির নাম মঞ্জরী। অনেক নিচে তাকে ঘন সবুজ ক্যানভাসে আঁকা রুপালী রেখার মত দেখাচ্ছিল।

নদীটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কতকগুলি সচল কালো বিন্দু চোখে পড়ল। সঙ্গে দূরবীন ছিল, তার মধ্য দিয়ে তাদের স্পষ্ট চিনতে পারি। গাওর। পনেরো ষোলটা গাওর নদীর ধারে চরে বেড়াচ্ছে।

দূরবীনের মধ্য দিয়ে গাওর-এর দলের গতিবিধি দেখতে দেখতে

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি—এতখানি খাড়াই বেয়ে ওরা নিশ্চয়ই এখানে উঠে আসতে পারবে না। বল্-সাহেব শুধু নয়, অরণ্যচারী বহু পর্যটক ও শিকারীর লেখায় গাওরদের হিংস্রতার পরিচয় পেয়েছি। এককভাবে মোটামুটি নিরীহ হলেও সম্মিলিতভাবে তারা বুনো মোষের মতই হিংস্র।

উৎরাইয়ের ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মাথা ঝিমঝিম করছিল, কাজেই সরে আসি ওখান থেকে। সেই সুঁড়িপথ ধরে ফিরে যেতে থাকি ধীরে ধীরে। যেতে যেতে হঠাৎ মনে হল এই পথটা হয়তো গাওর-দেরই পায়ে পায়ে তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ মঞ্জরী নদীর ধার থেকে এই খাড়াই বেয়ে উঠে আসে তারা এবং এই পথ দিয়ে যাতায়াত করে। একশো বছর আগে বল্ সাহেব সম্ভবতঃ এই পথ ধরেই গাওর-এর পালকে ঝাঁটি ও বেতগাছের ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছিলেন। হয়তো চিরকালই তাদের আনাগোনা ঘটছে এই পথ ধরে।

গাওরদের আস্তানা যদি মঞ্জরী নদীর ধারে হয়, এই দুর্গম চড়াই বেয়ে কেন উঠে আসে তারা এবং কোথায় যায় এই প্রশ্ন জাগতে পারে।

এই প্রশ্নের জবাব পেতে হ'লে এই পথ ধরেই যেতে হবে আমাকে এগিয়ে—হয়তো এই পথের শেষেই পেয়ে যাব এই প্রশ্নের উত্তর। কাজেই চলতে থাকি এই পথের অস্পষ্ট রেখাকে অনুসরণ ক'রে। আমার তাঁবুর কাছে বনের ঘনত্ব কমতেই পথের রেখাও অস্পষ্ট হয়ে আসে। কিন্তু তবু হারিয়ে ফেলি না তাকে—তার ওপর দিয়ে যেতে যেতে পৌঁছে যাই 'সল্ট-লিক্' অথবা বন্য প্রাণীদের নুনচাটার জায়গায়।

গাওরদের পায়ে পায়ে তৈরি পথ এই নোনা টিবিতে এসে শেষ হয়েছে, অতএব মঞ্জরী নদীর ধারের গাওর-এর পালের গন্তব্য যে এই টিবিটি এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না আমার। আবাস ওদের মঞ্জরী নদীর ধারে, সেখানেই চরে বেড়ায়—সেখানকার ঘাস লতা-পাতা ওদের খাদ্য। কিন্তু নুন চাটতে আসে এই টিবিতে উত্তুঙ্গ চড়াই বেয়ে। বল্-সাহেবের আমলে এসেছে, তারও আগে আসত, অতএব ধরে নিতে পারি আজও আসে। চিরদিনের আসা-যাওয়া তাদের এ-পথ ধরে।

এই পথের ধারে কোৎরাটিকে বল্‌-সাহেব শিকার করেছিলেন ব'লেই বিঘ্ন ঘটেছিল—তারা আক্রমণ করেছিল তাঁকে। যাতায়াতে বাধা কোন বন্য পশু সইতে পারে না, তারাও পারেনি। নইলে তাদের স্বভাব নয় অকারণ আক্রমণ, হিংস্রতার জন্য হিংস্রতা কোন বন্য প্রাণীর প্রকৃতিগত নয়।

নুন্‌ ছাড়া কোন প্রাণীর চলে না, খাদ্যে নুনের ন্যূনতা পূরণের জন্য কি রোজই তারা "সল্ট-লিকে" আসে? এই প্রশ্নের জবাব জানা নেই বন্যপ্রাণী-বিশারদদের। তবে তাঁরা বলেন যে, মাংসাশী প্রাণীদের চেয়ে তৃণভোজী প্রাণীদেরই নুনের চাহিদা বেশী, কারণ মাংসাশী প্রাণী তার শিকার করা মাংসের মধ্যে কিছুটা নুনের স্বাদ পেঁয়ে যায়। তৃণভোজীর খাদ্যে নুন প্রায় নেই বললেই চলে, কাজেই নুনের অন্বেষণে তার ব্যগ্রতা মাংসাশী প্রাণীকে বহুগুণ ছাপিয়ে যায়। অতএব নুন-চাটার জায়গায় তৃণভোজীদেরই আনাগোনা বেশি, প্রাত্যহিক হওয়াও আশ্চর্য নয়।

নোনা টিবিটা তখন শূন্য ছিল। দুপুর থেকে শুরু ক'রে ঘণ্টা তিন চার বনের পশুদের বিশ্রামের সময়। এ সময়ে সবরকম ক্রিয়াকলাপ বন্ধ রেখে বিশ্রাম নেয় তারা। আর কিছুক্ষণ বাদেই হয়তো সক্রিয় হয়ে উঠবে তারা—তাদের বিশ্রাম থেকে গাত্রোত্থান ক'রে শুরু করবে খাদ্যান্বেষণ। এই সল্ট-লিকেও আসতে পারে। কেউ না কেউ আসবেই। গাওররাও এসে যেতে পারে। কাছের থেকে ওদের দেখতে ইচ্ছে করছে আমার। কাজেই অদূরবর্তী একটি কেন্দ গাছের নিচে পাথরের চাতালে বসে অপেক্ষা করি।

প্রায় ঘণ্টাখানেক কারুরই দেখা পাই না। নিস্তব্ধ বনভূমির নৈঃশব্দ্যের বুকে আঁচড় কাটে ঘুঘুর একঘেয়ে ডাক। ঘুঘুর ডাকের সঙ্গে সুর মেলায় নাম-না-জানা আর একটি পাখির কল-কাকলি। এই নোনা টিবির বিশেষত্ব হল তার নিস্তৃণ নগ্নতা। চারপাশে গাছপালা ও লতাঝোপের ঘন সমাবেশের তুলনায় এখানকার বৃক্ষশূন্য নগ্নতা

বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বোধ হয়, লবণের আধিক্য সইতে পারেনি ব'লেই এখানকার মাটিতে গাছপালা কিছু গজায়নি।

অদূরবর্তী বনপানের ঝোপে স্পন্দন সঞ্চারিত হতেই আমার প্রতীক্ষার অবসান ঘটে। রুদ্ধশ্বাস কয়েকটি মুহূর্ত, তারপর বনপানের ঝোপটাই যেন কয়েকটি নীলগাই-এর আকার নিয়ে এগিয়ে আসে সল্ট-লিকের দিকে।

নীলগাই নামেই গাই—আসলে তা বড়ো আকারের হরিণ। নীলাভ তার গায়ের রঙ, বনের সবুজ রঙের সঙ্গে মিশে যায় ব'লে সহজে তাকে দেখা যায় না। সামনের ঐ বনপানের ঝোপটার সঙ্গে একাকার হয়ে ছিল বলে তাঁদের বনপানের ঝোপেরই রূপান্তর ব'লে মনে হচ্ছে। এগিয়ে আসছে ধীরে সুস্থে শ্লথগতিতে। তাদের চলার ভঙ্গী দেখে বোঝা যাচ্ছে, ভরপেট খেয়েছে তারা এই বনপানের পাতা। বনপান নামেই পান, আসলে পানের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই—তার পাতার আকার পানের মত ব'লেই তাকে বনপান বলা হয়।

বনপানের পাতায় তাদের যতই আসক্তি থাক, জলপান না ক'রেও দীর্ঘকাল থাকতে পারে নীলগাইয়েরা। একটানা বেশ কয়েকদিন ধরে নির্জলা থাকার অভ্যাস আছে তাদের। জলতেষ্টা তাদের পায় না বললেই হয়, কাজেই জলার ধারে কদাচিৎ ঘটে তাদের আনাগোনা।

জলের প্রয়োজন না থাক, নুনের প্রয়োজন তাদের পুরোমাত্রায় রয়েছে। নোনা ঢিবির ওপরে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে ওরা। সারি বেঁধে ঢিবির গা চাটতে থাকে তারা। লবণাক্ত মাটির স্বাদে বুঁদ হয়ে পড়ে—তাদের হাবভাবে মনে হয় যেন মাটির মধ্য থেকে অমৃতের আস্বাদ আহরণ করছে।

সল্ট-লিকের নুনের স্বাদে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েছে নীলগাইয়ের দল, এমন সময় কয়েকটি দাঁতালো শুয়োরের আবির্ভাব ঘটে। কোথা থেকে এল বুঝতে পারি না, তবে এল মূর্তিমান বীভৎসতার মত। মিশকালো রোমশ দেহ—মুখের দুপাশে দুটো ছুঁচোলো বাঁকা দাঁত বেরিয়ে আছে, যেন হাতির দাঁতের ছোট সংস্করণ। শুনেছিলাম, বুনো

শুয়োর স্বভাবে সাংঘাতিক হিংস্র হয়ে থাকে, তারা সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করলে বাঘ পর্যন্ত ঘায়েল হয়ে পড়ে। আমার আশঙ্কা হল, বুঝি এই বুনো শুয়োরদের দেখামাত্র ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাবে নীলগাইয়ের দল। কিন্তু সল্ট-লিকের লবণাক্ত স্বাদে তারা এমনি মশগুল হয়ে পড়েছে যে, বুনো শুয়োরদের উপস্থিতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তারা। বুনো শুয়োররাও অবশ্য ভ্রূক্ষেপ করে না তাদের দিকে, তাদের হিংস্রতা ভুলে যায় তারা সল্ট-লিকের স্বাদ নিতে গিয়ে।

নীলগাই ও বুনো শুয়োরের পর আসে চৌশিঙ্গা ও বারোশিঙ্গা হরিণ। তাদের পর আসে সম্বর। দল বেঁধে আসে। দিন কয়েক আগে এখানে এই দলটিকেই দেখেছিলাম। পাহাড়ীর কুঁড়েঘরের সেই সম্বর-সম্বরী অবশ্য নেই এদের সঙ্গে। সল্ট-লিকের লবণাক্ত মাটিকে কেন্দ্র ক'রে রকমারি প্রাণীর সমাবেশ ঘটে। কিন্তু এই সমাবেশের মধ্যে কোন রকম অসহিষ্ণুতা বা হিংস্রতা প্রকাশ পায় না। সল্ট-লিকের নুন বন্য প্রাণীদের মধ্যে একটি বিচিত্র সহাবস্থানকে সম্ভব ক'রে তুলেছে। চেয়ে দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে! সহাবস্থানের এমন বিচিত্র দৃষ্টান্ত আগে কখনো চোখে পড়েনি।

ক্রমশঃ সন্ধ্যা হয়ে আসে—নিবিড় ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আসে সমস্ত বন। গাছপালাগুলি ক্রমশঃ যেন অন্ধকারে একাকার হয়ে আসতে থাকে। এই অস্পষ্ট আলোয় দেখি, কৃষ্ণসার এবং চিতল হরিণরাও এসেছে। তারপর কুণ্ঠিত পদক্ষেপে আসে কয়েকটি চিংকারা। অবশেষে আসে সেই সম্বর-সম্বরী। ওদের দেখে আমার আশংকা হল বুঝি ঐ সম্বরের দল তেড়ে যাবে ওদের দিকে। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না। সম্বরের দলকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে তারা দু'জনে নুন চাটতে থাকে। সম্বরের দলও ভ্রূক্ষেপ করে না তাদের দিকে।

সকলের এই সমবেতভাবে নুনের স্বাদ নেওয়া দেখতে দেখতে আমার মনে হল যেন এই "সল্ট-লিক্" সব বন্য প্রাণীকে এক সূত্রে বেঁধেছে। নুন খেতে খেতে ভুলেছে তাদের বিরোধ, বিবাদ-বিসংবাদ।

পাশাপাশি নিঃশব্দে নুন চাটে তারা। বন জুড়ে শান্ত, স্তব্ধ পরিবেশের সঙ্গে সুর মেলায় তাদের এই অপরূপ সহাবস্থান।

হঠাৎ তাদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা যায়। প্রত্যেকেই হঠাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, প্রত্যেকেই উৎকর্ণ। কী যেন শোনে তারা কান পেতে এবং অপেক্ষা করে রুদ্ধশ্বাসে। তাদের চাঞ্চল্য আমাকেও স্পর্শ করে এবং তাদের সঙ্গে আমিও অপেক্ষা করি।

চারপাশের ঘনিয়ে আসা অন্ধকার এবং বাতাসের মধ্যে কিসের সঙ্কেত যেন পেয়েছে তারা। সকলেই যাকে ভয় পায় সে যেন আসছে। নুন চাটা বন্ধ হয়েছে সকলেরই, মুখ তুলে তাকায় তারা এবং বাতাসে গন্ধ শোঁকে—কোন দিক থেকে আসছে তা বোঝার চেষ্টা করে যেন।

কে সে বুঝতে পারি না। কিন্তু সে যে আসছে এদের হাবভাব থেকে তা বুঝতে পারি।

সে আসছে, কিন্তু কোন শব্দ নেই। পায়ের শব্দ বা ঘাস ও লতাঝোপের মধ্যে নড়াচড়ার আওয়াজ কিছুই কানে আসছে না।

তারপর হঠাৎ দৌড়তে শুরু করে তারা—চোখের নিমেষে অন্ধকারের মধ্যে উধাও হয়ে যায়, ফাঁকা হয়ে যায় সল্ট-লিক্।

ওরা চলে গেছে, চারিদিকের নিস্তব্ধতার পরিমাপ করে ঝিল্লীর ঝঙ্কার। এমন সময় অন্ধকার ফুঁড়ে সল্ট-লিকের অস্পষ্ট আলোর বৃত্তাভাসের মধ্যে বেরিয়ে এল প্রায় ত্রিশটা গাওর। অন্ধকারই যেন সৃষ্টি করেছে এই বিশাল বলিষ্ঠ প্রাণীকে। বিশিষ্ট বন্যপ্রাণীবিদ ই, হনুমন্ত রাও এদের কৃষ্ণকায় শক্তি (Black Power) বলে বর্ণনা করেছেন।

সকলেই চলে গিয়ে এদের জন্য জায়গা ক'রে দিয়েছে। অন্যান্য বন্য প্রাণীদের চোখে তারা ভয়ঙ্কর না খাতিরের পাত্র, তা ঠিক বুঝতে পারি না। ভয়ঙ্করত্বের নিরিখে বুনো মোষ বা বুনো কুকুর তাদের ছাপিয়ে যায়, কাজেই ধরে নেওয়া যায় যে নীলগাই, সম্বর প্রভৃতি তৃণভোজী প্রাণীরা তাদের বিশেষ খাতির ক'রে থাকে, যেমন আমরা খাতির করি মাননীয় জ্ঞানী-গুণীদের।

গাওরদের উদ্দেশ্যে এই বিশেষ খাতিরের প্রতিক্রিয়া আমার ওপরেও প্রভাব বিস্তার করে, আমি নিশ্চল হয়ে বসে থাকি কেন্দ গাছের তলায় পাথরের চাতালের ওপরে। গাওররা যতক্ষণ ঐ নোনা ঢিবির কাছে রইল, ততক্ষণ নড়তেও পারি না।

রাত ন'টা নাগাদ তারা চলে যাওয়ার পর আমি নেমে আসি পাথরের চাতাল থেকে। কৃষ্ণপক্ষের রাতের অন্ধকার চারপাশের সমস্ত গাছপালার শূন্যস্থানকে পূর্ণ ক'রে বনটাকে দুর্ভেদ্য ক'রে তুললেও অস্ফুট আলোর আভাস ফুটে ওঠে গাওরদের পায়ে পায়ে তৈরি সুঁড়িপথের ওপর দিয়ে। সেই পথ ধরে চলে আসি আমার তাঁবুর সামনে।

১৯

তাঁবুর সামনে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে! দেখামাত্র চমকে উঠি। মানুষের মত আকার হ'লেও মানুষ নয়। চোখের নিমেষে উধাও হয়ে যায় সে অন্ধকারের মধ্যে। যেন আমার অপেক্ষাতেই ছিল, আমাকে দেখামাত্র পালিয়ে যায়। বনমানুষ।

তাঁবুর কাছে গিয়ে দেখি, শালপাতায় জড়ানো ঝলসানো মাংস ও ভুট্টা তাঁবুর সামনে রাখা আছে। দুপুরের মত রাতের খাবারও বোধ হয় পাঠিয়ে দিয়েছে পাহাড়ী। নিজে না এসে ঐ জীবটির মারফত পাঠিয়ে দিয়েছে।

তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়াতেই অস্পষ্ট একটা স্বর শুনতে পাই। নারীকণ্ঠ। ফিসফিসিয়ে কার সঙ্গে কথা বলছে।

—কে ওখানে? আমি চমকে উঠে প্রশ্ন করি।

—আমরা হুজুর। পাহাড়ী জবাব দেয়: আমার বৌ ও আমি। ও আমাকে সইতে পারবে না ব'লে ওর কাছে যেতে পারিনি, কিন্তু ও ঠিক চলে এসেছে।

আমি ঢুকে পড়ি আমার তাঁবুর মধ্যে। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের ভগ্নাংশ তখন বনের মধ্যে অস্ফুট আলোছায়ার জাল বুনছে।

নারীকণ্ঠে আর্দ্র-আকৃতি।

—আর অন্ধকার নেই। ফিসফিসিয়ে বলে পাহাড়ী: আমাকে দেখ। চোখ মেলে দেখ।

—এই তো দেখছি। নারীকণ্ঠে অস্ফুট জবাব।

—কী দেখছ? একটা বীভৎস ভয়ঙ্কর মানুষ, তাই না?

—না। একটা সুন্দর মানুষ। দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর মানুষ।

নারীকণ্ঠ হয়ে ওঠে কামার্ত। তার সঙ্গে সুর মিলিয়েই যেন কোৎয়া

ডেকে ওঠে, বেজে ওঠে লক্ষ লক্ষ ঝিঁঝিপোকার করতাল। বনময় বনফুলের বাসরশয্যা পাতা হয় যেন।

নারীকণ্ঠে সোচ্চার হয়ে ওঠে চরম চরিতার্থতা। বনময় ছড়িয়ে পড়ে তার রেশ। নারীকণ্ঠের সুখ-শিহরণ বনের বাতাসকে শিউরে তোলে।

অবশেষে সব শান্ত হয়। সমস্ত বন নিঃশব্দ সুখসুপ্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে···

পরদিন ভোরে পাহাড়ী আসে আমার কাছে তার বৌকে নিয়ে। রীতিমত সুন্দরী যুবতী, গড় হয়ে প্রণাম করে আমাকে।

—এই আমার বৌ সীতা। পাহাড়ী সলজ্জ হেসে বললে, ওর বাপের বাড়ি থেকে চলে এসেছে।

ভোরের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে পাহাড়ীর মুখ। তার মুখের বীভৎসতা আমার চোখে পড়ছে না। ওর বৌয়ের মত আমিও সুন্দর দেখি ওকে।

পাহাড়ী বললে, জানলেন জঙ্গলসাহেব, সীতাকে এই উত্তুঙ্গ পাটপুরিয়া পাহাড়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে একটা হাতি। এখানকার বনে-জঙ্গলে তো হাতি নেই, কাজেই আমার ধারণা, আপনি যাদের খুঁজছেন, তাদেরই হাতি এটা।

—তুমি ঠিকই আন্দাজ করেছ! আমি বলি: ওরা দু'জন হাতির পিঠে চেপেই পালিয়ে বেড়াচ্ছে। হাতির দেখা যখন মিলেছে, তখন ওদের দেখাও পাওয়া যাবে। এখন থেকে হাতির সন্ধানও নেব···

—কী দরকার ওদের দেখা পাওয়ার। এখানে কোথাও লুকিয়ে আছে তো থাক্ না লুকিয়ে। এখানকার জন্তু-জানোয়ারদের পাশাপাশি সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর করছে তো করুক। ওদের খুঁজে বের করার চেষ্টা আর করবেন না জঙ্গলসাহেব।

—ওদের খুঁজে বের করার চেষ্টা না করলে ওদের উদ্ধার করার কী হবে?

—ওদের উদ্ধার করার দরকার কি! আদিবাসীরা এখানে ওদের

খুঁজতে আসবে না, কাজেই এখানেই ওরা নিরাপদ। ওদের উদ্ধার করার চেষ্টা করা মানেই ওদের বিপদে ফেলা।

পাহাড়ী ঠিকই বলেছে, কাজেই চুপ করে থাকি আমি। হঠাৎ যশপুরনগরের পূর্ণেন্দুর কথা মনে হল। শুভ্রজ্যোতি ও মানকীকে উদ্ধার করার প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, ওদের উদ্ধার করার আগে আদিবাসীদের অজ্ঞতা দূর করার চেষ্টা করুন। ওদের বুঝিয়ে দিন যে ডাইনী ব'লে কিছু নেই, মানকী ডাইনী নয় তা' ছাড়া বুঝিয়ে দিন যে মানকীকে ভালবেসে শুভ্রজ্যোতি কোন অপরাধ করেনি। তারপর ওদের উদ্ধার করতে আর একটুও অসুবিধে হবে না।